KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher [illegible]
Title [illegible]	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol & Number: 46/1 46/2 46/3 46/4 46/5	Year of Publication May 1985 Jun 1985 July 1985 Aug 1985 Sep 1985
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : [illegible], [illegible] চক্রবর্তী	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

জুলাই
১৯৮৫

এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত ড. **ভবতোষ দত্তের** 'প্রগতি এবং দারিদ্র্য' প্রবন্ধের সমালোচনাপ্রসঙ্গে সাতজন পাঠকের চিঠির প্রত্যুত্তরে লেখকের মন্তব্য।

রাজীব সরকারের প্রথম ছ মাস : ইন্দিরার কার্যশৈলী আর রাজীবের কার্যশৈলীর মধ্যে তফাত কোথায়? এদেশে রাজনীতি যাঁদের পেশা, তাঁরা কি তাঁদের পেশার দাবি সৎভাবে মেটান? **ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের** প্রশ্ন 'রাজনীতি ও রাজনীতিক' প্রবন্ধে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা 'পয়লা আষাঢ়ে'।
বাংলাদেশের 'কিত্তনখোলা' নাটকের পর্যালোচনা করেছেন **চিত্তরঞ্জন ঘোষ**।
সাহিত্য এবং সিনেমার সম্পর্ক নিয়ে পুরনো তর্ক আবার তুললেন **অশোক রুদ্র** এক নাতিদীর্ঘ চিঠিতে।
'পার' ছবির ভালোমন্দ নিয়ে আলোচনা।

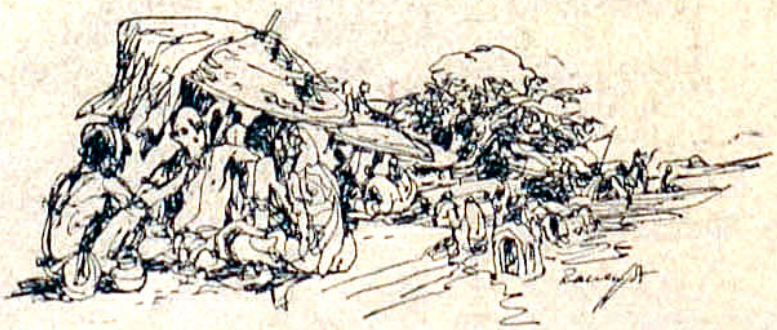

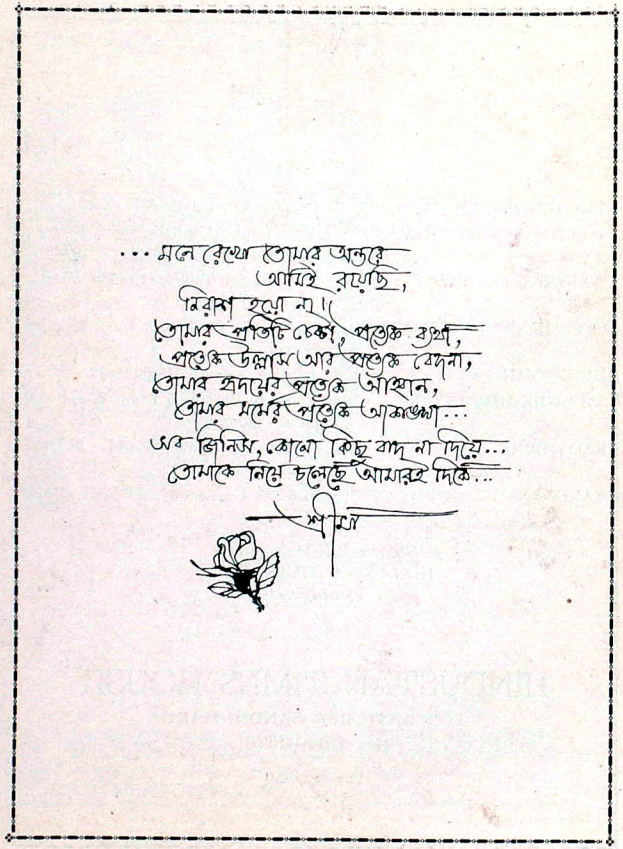

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক কথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বর্ষ ৪৬। সংখ্যা ৩
জুলাই ১৯৮৫
আষাঢ় ১৩৯২

নির্মলকুমার বসু হোসেনুর রহমান ১৮১
রাজনীতি ও রাজনীতিক ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ২২৯

পয়লা আষাঢ়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০১
ডাক কেন হে বৃষ্টি খালেদা এদিব চৌধুরী ২০২
আদিবাসী শিল্পকলা কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ২০৩
আবহ গৌতম দাস ২০৪

পোকামাকড়ের ঘরবসতি সেলিনা হোসেন ১৯৩
ক্রান্তদর্শী অন্নদাশঙ্কর রায় ২০৫
মহাপ্রয়াণ মিহির ভট্টাচার্য ২১৫
ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২২০

গ্রন্থসমালোচনা ২৩৩
অনিলকুমার বসু, রশীদ আল ফারুকী, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, জীবনবল্লভ চৌধুরী

আলোচনা ২৪৩
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, মৃগাঙ্কশেখর রায়, বর্ণালী দাস, অশোক ঘোষ

পাঠকের দৃষ্টিতে ২৫৫
ভবতোষ দত্ত, দিলীপনারায়ণ দে, অশোক রুদ্র

প্রচ্ছদচিত্র : রনেনআয়ন দত্ত

মুখপাতের ছবি। ইন্দ্র দুগার

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

প্রধান সম্পাদক। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক নবজীবন প্রেস, ৬৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

Book News

PHILIP ZIEGLER
MOUNTBATTEN :
The official biography.
Published by Collins. £ 15.03

E. M. FORSTER
THE NEW COLLECTED SHORT STORIES
Published by Sidgwick & Jackson.
£ 9.95

THE WORLD'S RELIGIONS
A comprehensive guide by EXPERTS.
Photographs, Maps, Diagrams and Fact-Finder by
REFERENCE SECTION.
Published be Lion Publishing £ 11.95

DIANA L. ECK
BANARAS : City of Light
'A luminous work, as befits this City of Light. I knew of few books that capture the soul of a sacred city to the degree that this one does'.—Huston Smith, Professor of Religion : Syracuse University.
Published by Routledge & Kegan Paul.
£ 7.95

ARTHUR BALASKAS
Foreword by R. D. LAING
BODYLIFE
Know, enjoy and increase the potential of your Body.
Published by Sidgwick & Jackson.
£ 7.95

Rupa & Co.

15 Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073
Also at :
Allahabad : Bombay : New Delhi

চতুরঙ্গ

প্রতি সংখ্যা তিন টাকা
সডাক গ্রাহকমূল্য বার্ষিক ৩৬ টাকা,
ষান্মাসিক ১৮ টাকা

এজেন্সির নিয়মাবলী

১। পাঁচ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না।

২। কমিশন শতকরা ২৫। পঁচিশ কপির ঊর্ধ্বে শতকরা ৩০।

৩। ডাক-খরচ আমরা বহন করি।

৪। কপি-পিছু দেড় টাকা আমাদের দপ্তরে জমা রাখতে হবে।

লেখকদের প্রতি নিবেদন

যাঁরা প্রকাশের জন্য কবিতা পাঠাবেন তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে নকল রেখে পাঠান—অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

অন্যান্য অমনোনীত রচনা যাঁরা ফেরত নিতে চান তাঁরা অনুগ্রহ করে উপযুক্ত পরিমাণে ডাক-টিকিট পাঠালে আমাদের সহায়তা করা হবে।

প্রেরিত রচনায় অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত বিদেশী ব্যক্তিনাম আর স্থাননাম থাকলে, সঙ্গে আলাদা একটি কাগজে ইংরেজি বড়ো হরফে সেগুলি লিখে দিলে উপকার হবে।

ময়ূরাক্ষী। ইন্দ্র দুগার

নির্মলকুমার বসু

হোসেনুর রহমান

নির্মলকুমার বসু বিদ্যাসাগর-যুগের বিশিষ্ট উত্তরসূরীদের অন্যতম। এবং নিঃসন্দেহে বলা চলে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর-যুগের সমাপ্তি ঘটলো।

এখন বিদ্যাসাগর-যুগ বলতে আমরা কী বুঝি? যুক্তিতর্ক সমাজসংস্কার। মানবপ্রেম এবং জ্ঞানচর্চা বিদ্যাসাগরের একমাত্র ধর্ম ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁর আর কোনো ধর্ম ছিল না। অতএব, সেই অর্থে ধর্মসংস্কারও বিদ্যাসাগরকে টানে নি। হিন্দু সমাজের গোঁড়ামি আর ধর্মান্ধতা ছিল তাঁর প্রধান শত্রু। যেন তেন প্রকারে ধর্মান্ধতার বিনাশ চাই। চাই হিন্দু সমাজের সংস্কার। ওই সঙ্গে ধ্বংস করতে চান বীরসিংহের মানবসিংহ দেশাচার এবং বিকৃত-ব্যাখ্যাত শাস্ত্র। এ কাজে তাঁর একমাত্র সহায় ছিল নিরঙ্কুশ বুদ্ধিবাদ ও বিজ্ঞানধারণা।

নির্মলকুমার এই ট্র্যাডিশনের সার্থক সন্তান। বিদ্যার্জনে, বুদ্ধির বিস্তারে এবং মানবপন্থার প্রাধান্যে আজীবন বিশ্বাসী তিনি এক অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরেও তিনি সর্বদা সপ্রতিভ, অম্লিষ্ঠ, সদাজাগ্রত এক বুদ্ধিগ্রাহ্য চেতনা বিশেষ। পরতে-পরতে বাগবাজারের বাঙালি নির্মলকুমার ধুতি-পানজাবি আর ফিতেবাঁধা শু-তে সর্বদা উপস্থিত এক অনবদ্য ভারতীয়। কথনে চলনে যুক্তিতর্কে মানবসম্পর্কসম্প্রসারণে নির্মলকুমার তাঁর সমসাময়িকদের এত মুগ্ধ করতেন যে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ আশপাশের বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে প্রায়ই অসম্ভব ছিল। গেরুয়া ধুতি-পানজাবিতে ঢেকে মচমচ শু-র অভিজাত পদক্ষেপে নির্মলকুমার যখন যেখানে হাজির হতেন তখনই তিনি যে উপস্থিত, আর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে হাতের ব্রীফ বা বটুয়া নামিয়ে রাখতে-রাখতে আরম্ভ করে দিলেন কথা বলতে, সে বিষয়ে শ্রোতাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তিনি এই আড্ডাকে যেমন মুখর করে তুলতে পারবেন, তেমনি পারবেন হিন্দু সমাজের বর্ণবিন্যাসের আলোচনায় বা গান্ধীচর্চায়। সহজ, স্বাভাবিক, অত্যন্ত আটপৌরে আলোচনায় (বা বলা উচিত ছিল কথকতায়) ভারি-ভারি সব তত্ত্বকথা বলে যেতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নতুন একজন নির্মল-কুমার ক্লাবের সভ্য অনেক সময় নেবেন বুঝতে যে কে এই নির্মলকুমার বসু। তারপর প্রচণ্ড এক বিস্ময় নিয়ে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে উন্নত হয়ে ফিরে যাবেন প্রথম দিনের নির্মলকুমার-পরিচিতি নিয়ে। ক্রমশ এই পরিচিতি এক মূল্যবান সম্পদে পরিণত হবে।

নির্মলকুমারের জীবন আলোচনা একটি প্রবন্ধে সানন্দে সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। নৃতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, ভারত-ইতিহাস ও সংস্কৃতি তাঁর জীবনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার একটি দিক মাত্র। অন্য একটি সমান মূল্যবান বিভাগ

ছিল স্বদেশ এবং স্বাধীনতা—অতএব, গান্ধীর আদর্শ ও গান্ধীবাদ।

আমরা এই নিবন্ধে মানুষ নির্মলকুমারকে প্রথম আকর্ষণ বিচার্য বলে মনে করছি। ওই সংগে এসে পড়বে তাঁর নৃতত্ত্ব-এবং সমাজ-বিজ্ঞান-প্রেম অনিবার্য কারণেই। বর্তমান লেখক মানুষ নির্মলকুমারকে তাঁর দেশ ও কালের আলোকেই বিচার করতে বেশি উৎসুক।

একটু আগেই বলা হয়েছে, স্বদেশী নির্মলকুমার যেন প্রকৃতির নিয়ম মেনেই গান্ধীর হাতে নিজেকে তুলে দিলেন। যিনি ১৯০১ সালে উত্তর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেছেন, ১৯১৯ সালে আই. এসসি পরীক্ষা শেষ করেছেন, ১৯২১-এ প্রেসিডেনসি থেকে ভূবিদ্যায় বি. এসসি পরীক্ষায় উত্তম ফল দেখিয়েছেন, তিনি গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে জড়িয়ে না পড়ে আর কী করতে পারেন? কিন্তু সেকালে একটা অসুবিধাও ছিল। সেই পরাধীন ভারতবর্ষে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যাঘ্র-বাঙালি শিক্ষকের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর হাত থেকে কোনো মেধাবী ছাত্র বা অধ্যাপকের পালিয়ে যাবার উপায় ছিল না। নির্মলকুমারের ভাগ্যেও ব্যতিক্রম কিছু ঘটল না। লেখাপড়া আগে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে সর্বস্বত্যাগ পরে। ফল হল, ১৯২৫-এ নির্মলকুমার নৃতত্ত্বে চূড়ান্ত ভালো ফল করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-শাখার সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান ও ব্রাহ্মমোহন মল্লিক স্বর্ণপদক প্রাপক নির্মলকুমার প্রবেশ করলেন মানবচর্চার জগতে। আর এই মানবচর্চা এক আশ্চর্য সংগতি পেল গান্ধীর রাজনীতিতে—নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমারের চিন্তায় আর কর্মে গান্ধী এসে জুড়ে বসলেন। সেদিন যদি গান্ধী ভারতবর্ষকে এমন করে এক অসহযোগ আন্দোলনে উদ্বেলিত করে না তুলতেন, তাহলে হয়তো বা নির্মলকুমার আর-পাঁচজন মেধাবী নৃবিজ্ঞানীর মতোই দেশে, আরো বেশি করে বিদেশে, এক নৃবিজ্ঞানী বলে পরিচিত হতেন মাত্র। বর্তমান লেখকের ধারণায়, নির্মলকুমার ছিলেন এক বহু-পরিচিত নৃবিজ্ঞানী—কি দেশে, কি বিদেশে। কিন্তু তিনি কেবল নৃবিজ্ঞানচর্চাতেই অনুরক্ত ছিলেন না। সেই সংগে ছিলেন ঐতিহাসিক, ভূগোলবিদ, মন্দির-বিশেষজ্ঞ এবং স্বাধীন গান্ধীবাদী। ভারতবর্ষের জনজীবন, মন্দির, তীর্থস্থান, জেলখানা, দরিদ্রপল্লী—এসবই তাঁকে সমান টানত। সমাজবিজ্ঞানীর যেসব গুণ থাকলে একজন তপ্ত মানুষ ওড়িয়ার কেওনঝড় রাজ্যের অরণ্যবাসীর চাষবাস আর জীবনধারার চর্চায় মেতে উঠতে পারতেন, তা তাঁর ছিল অতিমাত্রায়। আবার পুরী-কোনারক-ভুবনেশ্বরের মন্দিরচর্চা থেকেও তিনি দূরে সরে থাকতে পারেন নি। প্রাচীন স্থাপত্যবিদ্যায় তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি-বিধি প্রামাণ্য ভারত-ইতিহাস-গ্রন্থে এই সাক্ষ্য বহন করে যে তিনি গোঁড়া বা অভিমানী নৃবিজ্ঞানী ছিলেন না। এই কারণেই তাঁর সমসাময়িক সমাজচর্চার পণ্ডিত বন্ধুরা তাঁকে জাতিচ্যুত করেছিলেন! এঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যের মস্ত সমালোচক। কিন্তু এঁরাই আবার শিক্ষাচর্চায় জীবনধারণে একপ্রকার সুস্পষ্ট নতুন বর্ণাশ্রম-সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে জীবনধারণ করে গেলেন।

অতএব, একজন নৃবিজ্ঞানী কেন গান্ধীর প্রাইভেট সেক্রেটারি হবেন? কেন তিনি সাধারণ পত্রপত্রিকায় সাধারণ মানুষের পাঠযোগ্য প্রবন্ধাদি রচনা করবেন! এসব কোনো সমাজবিজ্ঞানীর করার কথা নয়! আর নির্মলকুমারের কথা ছিল ঠিক বিপরীত : আমি সমাজ-বিজ্ঞানী বলেই তো সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্যে লিখব। আবার ক্যানসার-রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত 'ম্যান ইন ইনডিয়া'র মতো স্পেশালিসট পত্রিকায়ও তিনি নিয়মিত লিখে গেছেন।

তিনি ছিলেন বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। প্রায় প্রতিটি বক্তৃতায় বলতেন, তিনি সমাজবিজ্ঞানী। যুক্তিতর্ক ধাপে-ধাপে তাঁর বক্তৃতায় সিঁড়ি বেয়ে একটা শিল্পকর্মের রূপ পেত। হ্যাঁ, তিনি সমাজবিজ্ঞানে কোনো মডেল পছন্দ করতেন না। বলতেন, ডোনট লুক ফর দ্য মডেল। লুক ফর দি আনএকসপেকটেড। সায়েনস পছন্দ করতেন, সায়েনটিজম পছন্দ করতেন না। আর আমাদের মতো দেশে আমরা মডেল ছাড়া বাঁচি কী করে!

নৃবিজ্ঞানী হিসেবে, ঐতিহাসিক হিসেবে, এবং শেষ পর্যন্ত একজন মানুষ হিসেবেই নির্মলকুমার হিন্দুর ইতিহাস, বর্ণ, জাতি—এসব নিরীক্ষণ করেছেন। সমাজ-সম্পর্কবিহীন গবেষক হিসেবে হিন্দু সমাজকে বহু-দূরবিস্তৃত এই সমাজের বর্ণবিন্যাস বিশ্লেষণ করে ভালো বা মন্দ বলে ছেড়ে দেন নি। বরং, বুঝতে চেষ্টা করেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বর্ণবৈষম্য হিন্দু সমাজে

টিকে থাকল কী করে? এমন-কি মুসলমান রাজশক্তি—যা ভারতবর্ষে এসে হিন্দুর সঙ্গে যথেষ্ট মিশে গেল না—ও বৃহত্তর মুসলমান সমাজ ধীরে-ধীরে হিন্দুর বর্ণপ্রথাকে অজ্ঞাতসারে নিজের সমাজের দেহের মধ্যে গ্রহণ করল। ক্রিশ্চান সমাজেও বর্ণপ্রথার দাপট দেখে চমকে যেতে হয়।

এই ব্যাপক সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রশ্ন নির্মল-কুমারকে মামুলি নৃবিজ্ঞানী হতে দেয় নি। হিন্দু সমাজের গঠন-চর্চা করেন যিনি তাঁকে নির্মলকুমারের 'হিন্দু মেথড অব ট্রাইবাল অ্যাবজরপশন' পড়তেই হবে—পড়তেই হবে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের অমূল্য পুস্তক 'হিন্দু সমাজের গড়ন'। এমন সুনিপুণ ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক আলোচনা এদেশে বিরল। প্রথমে গ্রন্থকারের আলোচনার কাঠামো মুগ্ধ করবে ইতিহাসের যে-কোনো ছাত্রকে। আলোচনার বিস্তার এবং হিন্দু সমাজের অভি-ব্যক্তিকে তুলে ধরা এক বিস্ময়কররূপে প্রথম শ্রেণীর কাজ। তিনি যে কলু বা তেলিদের মধ্যে (চতুর্থ অধ্যায়) বা মুণ্ডাজাতির ইতিহাসের মধ্যে (দ্বিতীয় অধ্যায়) থেকে ভারতের রূপ (সপ্তম অধ্যায়) থেকে ইংরেজ আমলে পরিবর্তনের ধারা থেকে বর্ণব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা থেকে (একাদশ অধ্যায়) পর্যন্ত বিরাট জমিনের ওপর হিন্দু সমাজের এক মূর্তি গড়ে তুলতে পারেন, সেটাই তো সেকালে সুধীজনদের চমৎকৃত করেছিল—উপকৃত করেছিল নৃবিজ্ঞানের ছাত্রমহলকে।

স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি আর সহজ ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণবিন্যাস বিচার করতে গিয়েও দিতে পেরেছেন। তাঁর অনন্যসাধারণ মননশক্তি তার জীব-দ্দশায় প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল। তিনি কেবল বুদ্ধি-জীবীর চোখ আর মন দিয়ে 'হিন্দু সমাজের গড়ন' লেখার দায়িত্ব পালন করেন নি। তাঁর সারা জীবনের হিন্দু-সমাজ-বিষয়ক অসংখ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রমাণ করে যে তিনি এসব মূল্যবান মানবপ্রধান রচনা প্রস্তুত করতেই পারতেন না যদি-না ক্ষুরধার বুদ্ধি, নিরন্তর জিজ্ঞাসার সংগে তাঁর মানুষকে দেখার আর বোঝার অসীম ক্ষমতাকে সমন্বিত না করতেন। নির্মলকুমার বহু অ-নৃবিজ্ঞানীকে দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রণিধানযোগ্য গবেষণার কাজ করিয়েছেন (সেগুলো কোনো সস্তা গল্পকাহিনী নয়)। তিনি বলতেন, ছেলেটি আন্দামান, কেরল বা লুসাই পাহাড়ে যেতে পারবে তো? না, বলবে, বাড়িতে বিধবা মা আছেন। স্যার, মাপ করবেন—ওটা পারব না। বলুন মার্কস-ডারউইনের ওপর থিসিস লিখে দিতে। এখুনি লিখে দিচ্ছি। বাঙালি ছাত্র প্রসংগে তাঁর মন্তব্য : "ওরা ভালো। একটু বেশি ভালো। ক্ষুরধার বুদ্ধি। কুলি-মজুরের, মাপজোকের কাজ ওদের আসে না। ওরা লাইব্রেরিতে বসে বিশ্বজয় করতে পারবে।"

স্বভাবতই পরিশ্রমী ছেলেমেয়েদের তিনি পছন্দ করতেন। বলতেন, বুদ্ধিশুদ্ধি থাকবে তো বটেই। তবে ওই সংগে চাই মানুষ সম্বন্ধে উদগ্র এক ঔৎসুক্য। থাকবে সমাজের যে ক্ষেত্রে সে কাজ করছে সেই জগৎটাকে আন্তরিকতা আর প্রেম নিয়ে বোঝবার অদম্য বাসনা।

নির্মলকুমার উচ্চাংগের কনভারসেশনালিসট ছিলেন—যেমন বাঙলায় তেমন ইংরিজিতে। গবেষকদের উদ্দেশে তাঁর একটি সতর্কবাণী ছিল : লাইফ ডাজ নট রিফ্লেকট ফ্রম বুকস। নিজে যেমন বই পড়েছেন তেমনই বইয়ে যা লেখা আছে তা মিলিয়ে নেবার জন্যে দেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তন্নতন্ন করে মানুষ আর সমাজকে দেখেছেন, বিচার করেছেন। তবেই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন।

হিন্দু সমাজের প্রসংগেও নির্মলকুমারের সিদ্ধান্ত অনুরূপ। হিন্দু সমাজের বর্ণ এবং জাতির বিচার করতে বসে তিনি দেশের উৎপাদনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, বারবার বলেছেন—বর্ণ এবং জাতির পারস্পরিক সম্পর্কটি ঠিকমতো ধরতে হবে। বর্ণ ও জাতি বিচার করতে গিয়ে যেমন প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকা পালন করেছেন প্রথম শ্রেণীর গবেষকের মতো (যাঁরা লাইব্রেরিতে বসে নৃতত্ত্ব চর্চা করেন তাঁদের তিনি বড়োই বিদ্রূপ করতেন), তেমনই মনু, গৌতম, পরাশর প্রমুখের রচিত স্মৃতিগ্রন্থচর্চায় বিমুখ হন নি কোনোদিন। বর্ণব্যবস্থার মধ্যে সংশ্লেষীকৃত জাতিসমূহের উৎপত্তি সম্বন্ধে ইতি-হাসের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করেছেন নৃবিজ্ঞানী হিসেবেই—হিন্দু হিসেবে নয়, আর তথাকথিত আধুনিকের মতো তো নয়ই।

প্রশ্ন করেছেন : কেনই বা এই সংশ্লেষ থেকে উদ্ভূত হিন্দু সমাজ নানা রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও, ঈষৎ বিকৃত আকারে হলেও, বেঁচে থাকতে সমর্থ হয়ে-ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী। এই বিষয়টির বিচার হোক

যথাযথ—এই ছিল নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমারের বিশেষ আকাঙ্ক্ষা।

হিন্দু সমাজের বর্ণব্যবস্থার মধ্যে আজ যাঁরা কেবল শ্রেণীভেদের লক্ষণটিকেই বড়ো করে দেখেন তাঁদের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের তিনি চিন্তা করে দেখতে বলেছেন, প্রাচীন ভারতে কেমন করে বর্ণব্যবস্থার দ্বারা প্রতিযোগিতাবৃত্তিকে দমন করে উৎপাদনব্যবস্থা (নন-কমপিটিটিভ প্রোডাকটিভ সিসটেম) রচনার চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর সুচিন্তিত মত ছিল, বর্ণব্যবস্থার এই দিকে পণ্ডিতেরা মনোনিবেশ করেন নি। এখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীর সঙ্গে। নির্মলকুমার বলছেন, প্রাচীন হিন্দু সমাজে প্রতিযোগিতাবৃত্তিকে একেবারে দমন করা হয়েছিল—এ কথা বলা যাবে না। হ্যাঁ সাধ্যমতো সেই প্রতিযোগিতার স্পৃহাকে সংকুচিত করবার বা শাসনে রাখবার বহুলপরিমাণে চেষ্টা চলেছিল। একই সঙ্গে তিনি বিশ্বাস করতেন, এরূপ সংশ্লিষ্ট সমাজ আর ধর্ম হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় কৃষি আর শিল্পের ওপরে নির্ভরশীল দেশের পক্ষেই উপযুক্ত। কিন্তু বিদেশী আক্রমণ অথবা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হলে এই সমাজ মানবজীবনকে আর রক্ষা করতে পারে না। যুক্তিসংগত কারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজের আগমনের পরই ধনতন্ত্রের শেকড় যখন এদেশের মাটিতে গেড়ে বসল হিন্দু সমাজ তখন উত্তরোত্তর দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, হিন্দুর যে প্রাচীন গ্রামীণ সভ্যতাকে (যে সভ্যতা মোটামুটি শান্তিপ্রিয় ছিল, এবং নিশ্চয়ই যুদ্ধবিগ্রহ বড়ো একটা পছন্দ করত না), ধরে রাখবার একটা ক্ষমতা ছিল বর্ণব্যবস্থাযুক্ত হিন্দু সমাজের।

এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ফরাসি নৃতত্ত্ববিদ লুই দুমং-কৃত 'হোমো হায়ারারকিকাস : দ্য কাসট সিসটেম অ্যানড ইটস ইমপ্লিকেশন' তিনি পছন্দ করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি এই বইটির দীর্ঘ এক সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেন 'ম্যান ইন ইনডিয়া' পত্রিকায়।

বর্ণ এবং জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে নির্মলকুমার লিখছেন : "রিগার্ডিঙ দ্য রিলেশনশিপ বীটুইন বর্ণ অ্যানড জাতি, দুমং ইজ সাবসটানশিয়ালি রাইট। বর্ণ ইজ এ কাইনড অব আইডিয়াল অর্ডার ইনটু হুইচ জাতিজ আর ইনকরপোরেটেড। হোয়েন মনু ট্রাইয়েড টু অ্যাকাউনট ফর দি ওরিজিন অব ভেরিয়াস জাতিজ বাই মীনস অব দি ইনটারমিকশ্চার অব বর্ণজ হি ওয়জ ইনডালজিঙ ইন অ্যান ইনটেলেকচুয়াল একসারসাইজ, অ্যানড নট স্টেটিঙ এ হিসটরিক্যাল ফ্যাকট। দুমং মে হ্যাভ ওভারলুকড ওয়ান সিগনিফিক্যানট সেট অব ভারসেস ইন মনুসংহিতা টু হুইচ হিজ অ্যাটেনশন মে বী ড্রন।

"মনু ক্লীয়ারলি সাবসক্রাইবড টু এ কাইনড অব থিয়োরি হেরিডিটি ইন হুইচ হি বিলীভড দ্যাট দ্য 'সীড' ওয়জ মোর ইমপর্ট্যানট দ্যান দ্য ফীলড। বোথ দ্য ফাদার অ্যানড দ্য মাদার কনট্রিবিউট টু দ্য টেমপারামেনটাল ক্যারাকটেরিসটিকস অব দি ইস্যু অ্যানড এভরি কমিউনিটি ইভেনচুয়ালি টেকস টু দি অকুপেশন হুইচ ইজ ইন কনফরমিটি উইথ ইটস নেটিভ টেমপারামেনট। হোয়েদার দিস ভিউ ইজ রাইট অর রঙ ইজ এ ভেরি ডিফরেনট কোয়েশচন ; বাট মনু বিলীভড দ্যাট ইট ওয়জ সো, অ্যানড হি ট্রাইয়েড টু ফিকস দ্য পজিশন অব এ জাতি ইন দ্য বর্ণ সিসটেম বাই দিস কাইনড অব ক্রুড সিউডোবায়োলজিক্যাল অ্যানালিসিস। দ্য মনুসংহিতা ইন ইটস প্রেজেনট ফরম ওয়জ রিটন বীটুইন ২০০ বি. সি. অ্যানড ১০০ এ. ডি. ; অ্যানড ইট ইজ হাইলি ইনটারেসটিং হাউ এ থিয়োরি অব হেরিডিটি ওয়জ কেয়ারফুলি ডিফাইনড ইন অর্ডার টু রেনডার পসিবল দি ইনক্লুশন অব নিউমারাস জাতিজ ইনটু দ্য স্কীম অব ফোর বর্ণজ।"

উৎসাহী পাঠক এই আলোচনার বিস্তৃতি দেখতে পাবেন তাঁর 'কালচার অ্যানড সোসাইটি (বোমবাই, ১৯৬৭, পৃ ২৩৭-৩৮) গ্রন্থে। গবেষণার কাজে ইতিহাস থেকে যেমন তিনি উপাদান নিয়েছেন তেমনই বিশ্বখ্যাত বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হয়েছেন অবলীলাক্রমে। তাঁদের মধ্যে আছেন বোয়াস, ক্রোবার, ফ্রয়েড। কারল মারকস তাঁকে কম আকর্ষণ করেন নি। ক্রোপোটকিনের মিউচুয়াল এড-ও তাঁকে প্রচণ্ড প্রভাবিত করে। কিন্তু নৃতত্ত্বে কোনো বিশেষ পাশ্চাত্ত্য মডেল তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেন নি। আর এখানেই তাঁর মানবিক চেতনা আর প্রখর মনীষার প্রধান পরিচয়। সেইজন্যেই সর্বদাই চঞ্চল, সন্ধানী মানবতন্ত্রী নির্মলকুমার বারবার চলে গেছেন বীরভূমের মুচি বা বারবনিতাদের পল্লীতে তাদের জীবনধারার সমীক্ষা নিতে আবার এই মানুষগুলোর জীবনের সংস্কার কী করে করা যায়, সে চিন্তাও তাঁকে অস্থির করেছে। সত্যের সন্ধানে তিনি সর্বদাই ছিলেন এক অস্থির রোমানটিক ব্যক্তিত্ব। নিজেই নিজের গবেষণাপদ্ধতি প্রস্তুত করেছেন পরিবেশ এবং প্রয়োজন অনুসারে। বর্তমানের কোনো দাবিকে তিনি কোনো দামি গবেষণাপদ্ধতির কাছে গচ্ছিত রাখেন নি। এই হল মহৎ গবেষকের সৎ গবেষণাপদ্ধতি। মারকিন দেশে তিনি বহুবার গেছেন। কিন্তু তাদের যান্ত্রিক মেথডলজি কোনো দিন তাকে মুগ্ধ করতে পারে নি। তাঁর বহু সমাজ-ইতিহাস রচনা তাঁকে প্রথম শ্রেণীর সোস্যাল হিসটরিয়ান হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে। 'দ্য গেজেটীয়র অব ইনডিয়া'র প্রথম খণ্ডে তাঁর 'সোস্যাল লাইফ' বা 'দ্য কালচারাল হেরিটেজ অব ইনডিয়া', বা 'দ্য জিয়োগ্রাফিক্যাল ব্যাকগ্রাউনড অব ইনডিয়ান কালচার' এই পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করে। এই শেষের প্রবন্ধের সার কথা হল : "দেয়ার ইজ অ্যান ওভার-অল ইউনিটি অব ডিজাইন হুইচ বাইনডস দ্য পীপল ইনটু ওয়ান ফ্যামিলি। দিস স্টেমস প্রাইমারিলি ফ্রম দি ইকনমিক অ্যানড সোস্যাল অরগানাইজেশন অব দ্য কানট্রি, অ্যানড রীচেস ওভার টু এ কমিউনিটি অব ইনটেলেকচুয়াল অ্যানড ইমোশনাল অ্যাটাচমেনটস অ্যানড ওবলিগেশনস। দ্য ডীটেইলস মাইট ভ্যারি ফ্রম প্লেস টু প্লেস, অ্যানড ফ্রম ওয়ান কাসট টু অ্যানাদার, ইয়েট দ্য সেমনেস অব ট্র্যাডিশনস অন হুইচ অল অব দেম হ্যাভ বীন রিয়ার্ড ক্যানট বী ডিনায়েড।" (পৃ ১৫)

এই রচনায় তিনি বামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, উপনিষদ ইত্যাদির সাহায্যে ভারতবর্ষের ঐক্যের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের ঐক্যবিচারের এই দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করি। কারণ, উপনিষদ, পুরাণ বা কুমারসম্ভব—রামায়ণ মহাভারত তো বটেই—ভারতের স্থায়ী কীর্তি। ভারতের চেহারা, চরিত্র নির্ণয় করতে হলে এদের কথা বলতেই হবে। দেশ পত্রিকার সুবর্ণজয়ন্তী সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'অখণ্ড ভারতের সাধনা'র বিষয়বস্তু ও ট্রীটমেনটের সঙ্গে নির্মলকুমারের এই প্রবন্ধটির প্রচুর মিল দেখা যাবে। আসলে এঁরা একই ইস্কুলের মানুষ। একে অপরকে না জানলেও কিছু এসে যায় নি। আমি কখনো নির্মলকুমারের মুখে ক্ষিতিমোহনের কথা বড়ো একটা শুনি নি। ধরেই নেওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ-নামক প্রখর সূর্যের খরতাপে যিনি প্রজ্বলিত হয়েছিলেন তিনি অবশ্যই ক্ষিতিমোহনের দেখা পেয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহনের এই প্রবন্ধ আমাকে মুগ্ধ করেছে। একটি মন্তব্য : এই মহৎ রচনাটি পড়তে-পড়তে ভাবছিলাম, আমরা বোধ করি ইংল্যানড-আমেরিকায় ডিগ্রী কিনতে গিয়ে আমাদের সর্বনাশ করলাম। অবিশ্যি নির্মলকুমার তো বিদেশে কম যান নি। ভরসা এই যে, যাঁরা সত্যি-সত্যি বিদেশের দ্বারা আক্রান্ত তাঁদের এমন সব সেকেলে বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন বলে নির্মলকুমারকে গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু বলেও মনে হত। তবে এসব খ্যাতি-অখ্যাতি তাঁকে টানত না। তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই ছিল সামনের দিকে। সর্বদাই তিনি ছিলেন আগামী পৃথিবীর মানুষ এক চিরন্তন পরিব্রাজক। ভারতপথিকের সঙ্গে মিশে গেল বিজ্ঞান কলেজের নৃতত্ত্ববিদ। তাঁর 'পরিব্রাজকের ডায়রি' সেকথাই মনে করিয়ে দেবে তরুণ পাঠকদের। এই সুষম খাদ্য তাঁর দেহমনকে গড়ে তুলেছিল বলেই তিনি প্রখর সমাজবিজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। তীক্ষ্ন ছিল তাঁর পর্যবেক্ষণশক্তি, মাপজোকের অদম্য বাসনা—যা দেখছেন, যাদের দেখছেন, তাদের হাড়-গোড় পর্যন্ত তাঁকে দেখতেই হবে। যাকে বলে যা দেখছেন তাই কেবল দেখছেন না। শেষ পর্যন্ত সেই অঞ্চলের মানুষদেরও দেখা চাই-ই। ওই সঙ্গে তাদের প্রেম প্রত্যয় প্রত্যাশা—সব, সব যে তাঁকে দেখতে হবে। তিনি প্যাট্রিক গেডেসকে খুব পছন্দ করতেন। লুই মামফোর্ডকে তাঁর কম পছন্দ ছিল না। তাঁর ছাত্রছাত্রীদের এসব গ্রন্থকারের বই পড়তে হত। তবে মুক্তমনা নির্মলকুমার কোনোদিনই নিজের মত ছাত্রছাত্রীদের মগজে ঢুকিয়ে দিতেন না। এই ইসকুলের শিক্ষকদের আর-একটা মস্ত বড়ো সম্পদ ছিল। এঁরা কোনোদিনই মগজধোলাই ব্যাপারটায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং অন্য মতের অন্য পথের ছেলেমেয়েদের প্রতি যথেষ্ট নজর দিতেন। বেশ একটু পক্ষপাতিত্ব করতেন বলা যায়। আজ বোঝা যায়, এঁরা কী অর্থে মূল্যবান শিক্ষক ছিলেন। এঁরা সত্যি-সত্যি কালচারাল প্লুরালিজমে আশ্বস্ত ছিলেন। এই পথে থাকলে পাছে আমাদের সাম্রাজ্য চলে যায়!—এসব ছোটো দুশ্চিন্তা এঁদের ট্র্যাডিশনকে ক্ষতবিক্ষত করে নি। এঁরা যত আমাদের স্মৃতিতে তলিয়ে যাচ্ছেন ততই আমরা চরম

যন্ত্রণায় অনুভব করছি—আজকের কলকাতায় যদি এঁরা থাকতেন! কেউ চিরকাল থাকবে না জানি। কিন্তু এঁদের কোনো উত্তরসূরী যে আজ একজনও অবশিষ্ট নেই। এই লাইনটি যখন লিখছি তখন মনে-মনে ড. সুকুমার সেনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। হ্যাঁ, তিনি তো অন্ধকার সমুদ্রে লাইটহাউস-স্বরূপ।

কর্মজীবনে নির্মলকুমার কখনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক ভূগোল পড়িয়েছেন, কখনো বিজ্ঞান কলেজের রীডার নিযুক্ত হয়েছেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ স্থগিত রেখে চলে গেছেন দেশের কাজে গান্ধীর ডাকে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৪ পর্যন্ত তিনি সারভে অব ইনডিয়ার ডিরেকটর এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপজাতি-সম্পর্কীয় উপদেষ্টারূপেও কাজ করেছেন। অবসরগ্রহণের পর নেফা অঞ্চলে শিক্ষাবিস্তারসমস্যার সরেজমিন সমীক্ষার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। এর পর ১৯৬৬-৬৯ তিনি তপশীলি এবং খন্ডজাতিসমূহের কমিশনার নিযুক্ত হন। সেদিন যেসব রিপোর্ট তিনি লোকসভায় পেশ করেছিলেন, আমাদের প্রশাসকগোষ্ঠী, সমাজবিজ্ঞানী আর রাজনীতিকরা যদি সেসব গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েন, উপকৃত হবেন। নির্মলকুমার বারবার বলতেন, সংরক্ষণনীতির কাঠামোর আমূল পরিবর্তন চাই। অন্যথায়, ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার ভয়াবহতার ইঙ্গিত তিনি দিয়ে গেছেন। আজ গুজরাতের দিকে তাকালে স্বভাবতই তাঁর কথা মনে পড়বে। একই কারণে ভেরিয়ার এলউইনের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয় নি কোনো দিন। আদিবাসীদের তিনি জাদুঘরের সামগ্রী করে রাখতে চান নি। এই পৃথকীকরণের দুটো কুফলের দিকে তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বারবার। এক : তারা যদি 'ঘেটো'তেই জীবনযাপন করে তাহলে একদিন 'তারা বনাম আমরা'—এই লড়াই হতে বাধ্য। দুই : বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে তারা যত দিন একীভূত হয়ে না আসবে তত দিন কোনো কোনো ব্যক্তি আর কোনো কোনো দলের কায়েমি স্বার্থ তাদের ঘিরে রাজনীতি করে যাবে। নির্মলকুমার তেমন এক মানবতন্ত্রী নৃবিজ্ঞানী যিনি এই দেশের আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের জন্যে সব রকমের প্রয়াস করে গেছেন। কিন্তু তিনি চান নি যে, ভারতের অনুন্নত সম্প্রদায় চিরকাল অনুন্নতই থেকে যাক বা চিরকাল বৃহত্তর সমাজ থেকে দূরে নির্বাসিত জীবন যাপন করুক।

এই যুক্তি আর অনুভূতি মনে রেখে নৃতত্ত্বসমীক্ষার পরিচালক নির্মলকুমারের বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফল 'পেজানট লাইফ ইন ইনডিয়া' নামের মনোগ্রাফটি সমাজবিজ্ঞানের যে-কোনো পাঠকেরই অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। সেকালে এই পুস্তিকার প্রশংসা করে এক সমালোচনা অধুনালুপ্ত ইংরিজি দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ডে প্রকাশিত হয়। সমালোচনাটি লেখেন জে বি এস হলডেন। এই পুস্তিকাটি প্রমাণ করে গোটা ভারতবর্ষে বাসস্থাননির্মাণে, উৎপাদনপদ্ধতিতে, পোশাকপরিচ্ছদে, খাদ্যাভ্যাসে একটা গভীর মিল আছে, ধরুন পূর্বের সঙ্গে দক্ষিণের, পশ্চিমের সঙ্গে উত্তরের। এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমার প্রায়ই বলতেন, 'ভারতের গ্রামজীবন' পুস্তিকাটি পড়লে ও তার ভেতরের সাদাকালো ছবিগুলো দেখলে কলকাতার ছেলেমেয়েরা প্রায় প্রত্যক্ষ জানতে পারবে : কেরলের ছেলেমেয়েরা সকালবেলা কী দিয়ে ব্রেকফাসট করে। (পরমুহূর্তেই ঠাট্টা করে বলতেন, এত কাল তো আমরা জেনে এসেছি লনডনে ছেলেমেয়েরা সকালবেলা কী দিয়ে ব্রেকফাসট করে।) পুস্তিকাটিকে ভারতের পার্থিব সংস্কৃতির অভিধান বলা চলে। এই কথাই পরমশ্রদ্ধাভরে বলেছিলেন হলডেন। ১৯৬১-৬২ সালে এই মূল্যবান পুস্তিকাটি ভারত-সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের চেষ্টায় বহু ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়।

এই পুস্তিকাটি প্রমাণ করে যে, আমরা ইতিহাস-বইয়ের 'ইউনিটি ইন ডাইভারসিটি' অধ্যায়ে ভারতবর্ষের যে চেহারা দেখে থাকি (আদৌ কি কিছু দেখি?), সেই চেহারার তুলনায় এই পুস্তিকা অনেক মূল্যবান। 'ভারতের গ্রামজীবন' ('পেজানট লাইফ ইন ইনডিয়া'র বাঙলা অনুবাদ) আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজকারবারের এক জ্বলন্ত চলমান ছবি। দেশটাকে বোঝবার জন্যে পার্থিব সংস্কৃতির এই চেহারা আর চরিত্র অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ হিন্দু চাষ করে, ঘর বাঁধে, কাপড় বোনে, ভাত কিংবা রুটি খায়। মুসলমান-ক্রিশচান-হরিজনও এসব নিত্যকর্ম করে থাকে। তার অর্থ এই নয় যে, এসব নিত্যকর্ম সবাই এক ও অভিন্ন পদ্ধতিতে করছে। কিন্তু এদের এই ব্যবহারিক জীবনযাপনের ধারা থেকে প্রমাণ

হচ্ছে এরা সবাই ভারতীয়। এরা সবাই একে অপরের সঙ্গে নিত্যলেনদেন করছে। একে অপরের ওপর নির্ভর করছে। ভারতবর্ষের পার্থিব জীবনের এই ঐকতান আজ আমরা যদি উত্তমরূপে শুনতে পাই তো বেঁচে যাই। এমন সব কাজের জন্যেই নির্মলকুমারকে অনেক সময় অনেক অপ্রশংসার বাণী শুনতে হয়েছে। গম্ভীর মুখে সামান্য হাসিতে ব্যস্তসমস্ত নির্মলকুমার নিজের কাজে মনোনিবেশ করতেন।

লিখতে বা পড়তে আরম্ভ করে দিলেই যিনিই ঘরে থাকুন তাঁকে এবার প্রস্থান করতেই হবে। তাঁর মধ্যে অকস্মাৎ এমন এক কঠিন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেতে পারত যে প্রিয় ছাত্র বা বন্ধুকে তখনকার মতো বিদায় নিতেই হবে। আবার পরের দিনই হয়তো-বা কোনো সভায় বা আড্ডায় দেখা হল। সেই সহজ অথচ দৃঢ় মানুষটি—প্রায় বুঝতেই পারা যাবে না যে ইনিই সেই ব্যক্তি যিনি স্বচ্ছন্দে একটু পরেই মারকিন রাষ্ট্রদূত গলব্রেথের সঙ্গে গান্ধী বা ভারতবর্ষের রাজনীতি নিয়ে গভীর আলোচনায় বসে পড়বেন। বা, কলেজ স্ট্রীটের প্রেসিডেনসি কলেজের রেলিঙে পুরনো বইয়ের সারিতে বই দেখতে-দেখতে অনেক দূরে চলে যাবেন। আপনি কিন্তু তাঁকে লক্ষ করে চলেছেন। হঠাৎ দেখলেন, সেই সনাতন দু-নমবর বাসে গিয়ে উঠলেন। তিনি ট্যাকসিতে উঠছেন, এটা কেউ খুব কমই দেখে থাকবেন। আপাতদৃষ্টিতে বেশ কৃপণ মনে হতে পারত তাঁকে। আবার সেই মুহূর্তেই কোনো ছাত্রকে অবাক করে দিয়ে বললেন, কাল তুমি যে বইগুলো আবদুলের দোকান থেকে কিনেছিলে, ওই ১৭২ টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি। এর পরে ওই ছাত্রের পক্ষে সম্ভব হত না কোনোদিনই, মাস্টারমশায়, আমি—। ওই ব্যাপারটার ওখানেই ইতি। এই গেল এক-নিশ্বাসে-বলা নির্মলকুমারের একটি পরিচ্ছন্ন নির্মল দিক। অন্যদিকে আমরা এমন বহু তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তি দেখেছি যিনি আজীবন আমায় বেশ চেনেন। দেখা হলেই কথাবার্তাও বলেন। কিন্তু হঠাৎ যদি কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর ভি আই পি (প্রথম শ্রেণীর হলে তো কথাই নেই) তাঁর প্রতি সদয় হন, আর মরতে সেই সময়ই ওঁকে আমি বলতে গেলুম—ভালো আছেন? আর ভালো আছেন! তখন তিনি আমায় কী করে চেনেন!

এসব ক্ষুদ্রতা নির্মলকুমারকে কোনোদিন আক্রমণ করে নি। তাঁকে শেষ পর্যন্ত আক্রমণ করল কর্কটরোগ। তাঁর এক অকৃত্রিম বন্ধু অতীব চমৎকার করে বলেছিলেন : না না, ওসব কর্কটরোগ-টোগ নির্মলের কিছু করতে পারবে না। ওসব ও মনের আর দেহের জোরেই নস্যাৎ করে দেবে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন—নির্মলকুমার এমনই বলিষ্ঠ মানুষ ছিলেন।

গবেষক নির্মলকুমারের প্রতিভা কেমনতর ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষা ধার করে বললে তা সহজে বোঝানো যাবে—"পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালোরূপে সিদ্ধিলাভ করবার উপযুক্ত মেধা আমাদের দেশের ছেলেদের মধ্যে দুর্লভ নয়। কিন্তু বোধশক্তির পরিকীর্ণ প্রভাবকে সমঞ্জসীভূত করে সজীব সত্তায় পরিণত করতে পারে, তা অল্পই দেখা যায়।" নির্মলকুমার সেই দু-এক জনের মধ্যে একজন। এবং অনন্য একজন।

একজন নৃবিজ্ঞানী স্বাভাবিক কারণেই গান্ধীর প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। কারণ গান্ধীর কাছে আপামর সাধারণ মানুষ সবচেয়ে প্রিয়। গান্ধী ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী মানুষ। তাঁর অহিংসাব্রত সেই সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম। আর নৃবিজ্ঞানীর গবেষণায় তো সবচেয়ে বড়ো মানুষ-নামক উপাদান। এবং যথাসম্ভব সাধারণ মানুষ, প্রাচীন মানুষ। অতএব, সংগত কারণেই, নির্মলকুমার চলে গেলেন গান্ধীর কাছে। সরল বাইবেলীয় ইংরিজিতে গান্ধীর সংকল্প হল : আই অ্যাম নট এ ভিশনারি। আই ক্লেম টু বী এ প্র্যাকটিকাল আইডিয়ালিসট। দ্য রিলিজন অব নন-ভায়োলেনস ইজ নট মেনট মীয়ারলি ফর দ্য ঋষিজ অ্যানড সেনটস। ইট ইজ মেনট ফর দ্য কমন পীপল অ্যাজ ওয়েল।" (সিলেকশনস ফ্রম গান্ধী, এন কে বোস, পৃ ১৪৯)

১৯৩৪ থেকে নির্মলকুমার গান্ধীর আকর্ষণ অনুভব করেন। এবং ১৯৪৬-এর ঐতিহাসিক সময়ে তিনি গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালিতে উপস্থিত থাকেন। বলা বাহুল্য, গান্ধীর আদর্শ আর জীবন তাঁকে টেনেছিল। কিন্তু গান্ধীর কাছে তিনি গেলেন একেবারে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী ও মানবতন্ত্রী হিসেবে। প্রধান বাসনা—গান্ধীর কর্মপদ্ধতিকে দেখা। অহিংস অসহযোগের বিজ্ঞান-দর্শনটি স্থির বিজ্ঞানীর মতো বুঝতে চেষ্টা করা। এবং সর্বোপরি, গান্ধীর কাছে গিয়ে স্বরাজ্যরচনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান।

প্রথম একটি সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করি। গান্ধী বললেন, নির্মলবাবু, আজ আপনি প্রার্থনাসভায় আসছেন তো? নির্মলকুমারের বিনীত অথচ স্পষ্ট উত্তর : না, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। অতএব, প্রার্থনাসভার প্রার্থনা আমার কাছে নিরর্থক। সঙ্গে-সঙ্গে গান্ধী বললেন, ভগবানে আপনি না বিশ্বাস করুন, সংগীতে আপনার অপ্রেম নেই আশা করি। সংগীতে নির্মল-কুমারের দ্বিধা ছিল না। দুজনেই বিশ্বাস করতেন, দুটো মত বহু দূর পর্যন্ত পাশাপাশি থাকতেই পারে। তবে দুজনেই একটা চূড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে চাইবেন নিশ্চয়ই। এবং দুজনের এগিয়ে যাবার উপায় এক হতে বাধ্য। অর্থাৎ, হিংসায় স্বাধীনতা আসবে—একথা নির্মলকুমার যদি বলতেন? তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কোনোদিনই গান্ধীর একান্ত সহযোগী আর সচিব হয়ে নোয়াখালি যেতে পারতেন না।

যুক্তিতর্কের আলোকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে গান্ধীবাদকে তুলে ধরলেন নির্মলকুমার। কোনো ধর্ম-ধর্ম ভাব নিয়ে গান্ধীকে ভগবানের আসনে বসাতে চান নি তিনি। এ-সবকিছুর স্বাক্ষর বহন করে তাঁর একাধিক রচনা। নির্মলকুমার ঐতিহাসিক নোয়াখালি-অধ্যায়কে লিপিবন্ধ করেছেন বহুবিতর্কিত 'মাই ডেজ উইথ গান্ধী' পুস্তকে। এই বই আমেদাবাদের নবজীবন প্রেস ছাপাতে পারে নি। ছাপালে নাকি গান্ধীর চরিত্রহনন করা হত। এসব বৃত্তান্ত লেখক বইয়ের ভূমিকায় বিশদ-ভাবে লিখেছেন।

বইটির প্রধান দুটি অংশ। একটি গান্ধীর মানবিক-অহিংস পন্থা (যা তিনি দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দুদের প্রতি কঠোরভাবে পালনের উপদেশ দিলেন)। অন্যটি অবি-ভক্ত স্বাধীন বাঙলা রক্ষার প্রয়াস-ইতিহাস। তৃতীয় অন্য একটি আকর্ষণ—গান্ধীর কিছু ব্যক্তিগত পরীক্ষা-মূলক আচরণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এই শেষের বিষয়টি নবজীবন-কর্তাদের বিপদে ফেলে। তাঁদের কর্তা লেখককে উপদেশ দেন : "আই অ্যাম অব ওপিনিয়ন দ্যাট ইয়ু বী বেটার অ্যাডভাইজড টু লীভ আউট অব দ্য বুক বাপুজ একসপেরিমেনটস ইন সেকস অর ব্রহ্মচর্য অ্যানড রিকনস্টিটিউট দ্য বুক টু সে অ্যাবাউট বাপুজ গ্রেট ওয়র্ক ইন নোয়াখালি।"

বলা বাহুল্য, এই উপদেশ নির্মলকুমার গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি এই বইয়ের বিতর্কিত অংশ বর্জন না করেই নিজেই ছাপালেন কলকাতা থেকে। পরে অবশ্য বইটি বোমবে থেকে ছাপা হয়।

প্রথম বিষয়টি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রসঙ্গ : দাঙ্গাবিধ্বস্ত হিন্দুদের কী কর্তব্য এখন? কোথায় তারা যাবে এখন?

"টু দ্য রিফিউজিজ, হি সেইড এগেন দ্যাট ইট ডিড নট ম্যাটার ইফ দেয়ার হোমস হ্যাড বীন বারনট অর প্রপার্টি লুটেড, সো লঙ অ্যাজ দে হ্যাড দি উইল টু ফেস দ্য ক্যালামিটি উইথ কারেজ অ্যানড ডিটারমিনেশন। দে শুড বিলড আপ দেয়ার লাইভস অ্যানিউ অন দ্য ফাউনডেশন অব দেয়ার ওন লেবার। দ্য রিফিউজিজ শুড ব্রেভলি ফেস দ্য রিয়লিটি অ্যানড লারন সাম ক্র্যাফট বাই হুইচ দে কুড আরন দেয়ার ব্রেড অ্যানড মেইনটেইন দেয়ার ফ্যামিলিজ। দোজ হু ডিড নট লেবার বাট লিভড অন দ্য টয়েলস অব আদারস ওয়্যার থীভস। নো ওয়ান ওয়জ ফ্রী ফ্রম দি ওবলিগেশন অব ভলানটারি লেবার ইন অর্ডার টু সাপোর্ট হিমসেলফ।" (পৃ ১৪২)

আমি মানবেতিহাসে অন্য কোনো মহাপুরুষের কথা জানি না যিনি বিধ্বস্ত মানবসংসারের সামনে দাঁড়িয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা বলতে পারেন। বলতে পারেন : তোমরা তো এত দিন ধনের গৌরবে, বর্ণের ঐশ্বর্যে নিম্নজাতিদের মানুষের আসনে বসতে দিতে পার নি। তারা তোমাদের ঘরবাড়ি আগলেছে, গোলা ভরেছে, ধনবৃদ্ধি করেছে, কিন্তু তোমাদের কাছে মনুষ্যত্বের কোনো দাবি নিয়ে এসে দাঁড়াতে পারে নি। আজ যদি এই ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে সেই মহাসুযোগ এসে থাকে, তার সদ্ব্যবহার করো। "শুচি করো মন, ধরো হাত সবাকার"।

এর পরের পৃষ্ঠায় গান্ধী বলছেন : "অ্যানড ইফ এভরিওয়ান দাস রিপেইড হিজ ডেট টু দোজ হু ওয়্যার দেয়ার ভেরি ওন, দেন দ্য পুয়োর মুসলিমস উড নো লঙ্গার লুক আপন দেম অ্যাজ মেন বিলঙিঙ টু এ ডিফ-রেনট ফেইথ, বাট অ্যাজ ফ্রেনডস হুজ প্রেজেনস এনরিচড দেয়ার লাইভস ইনস্টেড অব রেনডারিঙ দেম পুয়োর।"

এই হল নৃবিজ্ঞানী নির্মলকুমারের গান্ধী-নৃতত্ত্ব। জানি না, এই মন্তব্যের চেয়ে বেশি মর্মান্তিক, বেশি মানবিক কোনো ঐতিহাসিক উচ্চারণ বিংশ শতাব্দীর

সভ্য মানুষ শুনেছে কিনা। যারা সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রাণধারণের যন্ত্রণাটুকু নিয়ে গান্ধীর দরবারে এসে-ছিল পরম সান্ত্বনা প্রার্থনা করতে, তাদের তিনি যথার্থ উপদেশ দিলেন। দ্বিধা নেই, মায়া নেই, মমতা নেই। মহাকাল যেন গান্ধীর সব কেড়ে নিয়েছে। আছে শুধু ন্যায়বিচারবোধের চেতনা। যথার্থই গান্ধী দেশবাসীর কাছে বড়ো বেশি দাবি করেছেন সারা জীবন। এই নাকি তাঁর মস্ত দোষ ছিল। আর একটা গুণও ছিল বইকি। যেমন ত্যাগ করতে বলেছেন আমাদের। তেমনই যেদিন সময় এল সেদিন নির্বিচারে সব দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

নির্মলকুমার গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, গান্ধী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের সামাজিক পরি-বর্তন সামাজিক উন্নয়নের দিকে নজর দিতেন। এবং বলতেন, সবার আগে উপায় আমাকে ঠিক রাখতে হবে। তাতে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে কি যাবে না, সে হল স্বতন্ত্র কথা।

গান্ধীর জীবনদর্শনের এ-সমস্ত দিক নির্মলকুমার তুলে ধরলেন। গান্ধীমহলে তাঁকে প্রোটেসট্যানট গান্ধী-বাদী বলা যেতে পারে।

গান্ধী যে সোস্যাল অ্যাকশনের এক শান্তিপূর্ণ পথ এবং যুক্তি তৈরি করেছিলেন, এসব আজও ভালো করে জানি না। এই অজানায় একপ্রকার শান্তি আছে মানি। কিন্তু যদি গান্ধীপর্ব তেমন করে আমরা চর্চা করতাম তাহলে আজ আমরা অনেক অসাম্য, অনেক অশিক্ষা, বর্ণসংকট এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারতাম।

১৯৬৯ সালে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগে সভাপতির ভাষণে নির্মলকুমার মারকস এবং গান্ধীর বৈপ্লবিক পন্থার আলোচনা করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, কোথায় তাঁরা একই জগতের মানুষ। দুজনেই মনুষ্যজাতির মঙ্গল চান। দুজনেই চান দারিদ্র্যের অবসান। তারপর দেখালেন, কোথায় তাঁরা এর পর ভিন্ন-ভিন্ন পথে চলে গেলেন।

শিক্ষাব্রতী নির্মলকুমার দেশব্রতী ছিলেন কম নয়। কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু ছিলেন কংগ্রেসের ঘরের মানুষ। কারণ : স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষা। কারণ : কংগ্রেসের সঙ্গে নিখিল ভারত একাত্ম হতে পেরে-ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের আভাস 'মাই ডেজ উইথ গান্ধী' বইতে পাওয়া যাবে। দেশবিভাগের প্রাক্কালে তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে নানা ভূমিকায়। ১৯৪৭ সালে "হি ওয়জ অ্যাপয়েনটেড বাই দ্য কংগ্রেস প্রেসিডেনট টু ওয়রক ফর দ্য কমন, এগ্রীড ডিমানড বিফোর দ্য র‍্যাডক্লিফ মিশন টু বী মেড বাই নন-মুসলিম পার্টিজ।"

নির্মলকুমার বাঙলায় আর ইংরিজিতে লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। যেমন, তিনি অনবদ্য ইংরিজিতে লিখে চলেছেন নৃতত্ত্ব থেকে গান্ধী থেকে জাতীয় সংহতি থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল থেকে মেথডস ইন অ্যানথ্রোপলজিক্যাল স্টাডি অব ইনডিয়ান সোসাইটি। তেমনই দুর্বার বেগে তাঁর কলম চলেছে বাঙলা রচনায়। তাত্ত্বিক বিষয় থেকে স্বচ্ছন্দে চলে গেছেন সমকালের দাবি মেটাতে—১৯৬৪ সাল। কলকাতায় দাঙ্গা হচ্ছে। ২৮ এপ্রিল, সকাল ৭-৩০—১০-৩০। লিখছেন 'গণতন্ত্রের সংকট।' সম্ভবত পরের দিনই এই মূল্যবান প্রবন্ধ আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য ছিল : দাঙ্গা থামাতে সামরিক বাহিনী নামাতে হল। এটা তিনি দুঃখজনক বলে বিবেচনা করেন। তিনি লেখেন, "ইহাকেই আমি গণতন্ত্রের বৃহত্তম সংকট বলিয়া মনে করি। কাশ্মীরের সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দারিদ্র্য এবং ধনবৈষম্যের সমস্যা, সকল সমস্যারই সমাধান ধীরে-ধীরে করা যায়, যদি গভর্নমেন্টের প্রতি সাধারণের আস্থা ও সহযোগিতা অটল থাকে। কিন্তু বাহিরে না হইলেও ভিতরে-ভিতরে যে অনাস্থা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহার প্রমাণ এখনই পাওয়া যায় যখন জনতা বিক্ষুব্ধ হইয়া নিজের হাতে অপরাধীকে সাজা দিবার, নিরপরাধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করে। বিপদ এইখানে বেশি। এবং যত দ্রুত এই অনাস্থা বৃদ্ধি পাইবে, অথবা পাইতে দেওয়া হইবে, ততই লোকে ভাবিবে, এরকম গভর্নমেন্টের চেয়ে যদি সারা দেশ সামরিক শাসনের অধীনে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সব চোরাকারবারি শায়েস্তা হইয়া যাইবে, এবং আমাদের সর্ববিধ দুঃখের অবসান হইবে।

"এই মনোভাবকেই গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বাপেক্ষা... বিপদ বলিয়া মনে হয়। গান্ধীজী ভারতবর্ষের মানুষকে তন্নতন্ন করিয়া চিনিতেন। হিংসাত্মক বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাঁহার একটি প্রধান আপত্তি ছিল, সেরূপ বিপ্লবের ফলে

সমগ্র সমাজের শাসনভার একটি ক্ষুদ্র শ্রেণীর হাতে আসিয়া পড়িবে। আর যদি জনগণের সত্যাগ্রহের দ্বারা ক্ষমতার হস্তান্তর হয়, তাহা হইলে জনসাধারণই প্রকৃত শক্তির অধিকারী হইবে।

"বর্তমান সংকটকালে যদি ভারতবাসীর মন উত্তরোত্তর সিভিল গভর্নমেন্টের প্রতি আস্থা হারায়, তাহা হইলে ভারতের ভাগ্যে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এ আশঙ্কা নিতান্ত কাল্পনিক নয়। এবং ইহার চেয়ে ভারতের আরও অধিক দুর্দিন আর কী হইতে পারে? কেননা এখন জনগণের স্বরাজ স্বপ্নের মতো অলীক বস্তুতে পরিণত হইবে।" (প্রথম খসড়া থেকে উদ্ধৃত)

১৯৬৪-তে নির্মলকুমার যে দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন সেই দুশ্চিন্তা আজ বহু চিন্তাশীল মানুষের কাছেই দুঃস্বপ্নের মতো। এই ছত্রটি যখন লিখছি তখন শিখ সন্ত্রাসবাদ আর আমেদাবাদের দাঙ্গা বর্তমান ভারতবর্ষকে বহুলপরিমাণে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে।

নির্মলকুমারের বাঙলা প্রবন্ধ তিরিশ-চল্লিশের দশকে 'শনিবারের চিঠি', 'প্রবাসী', 'দেশ' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধের বিষয়—হিন্দু-মুসলমান (সম্ভবত ১৯৩৮-এ শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়) থেকে গান্ধী থেকে আদিবাসী থেকে বর্ণাশ্রম পর্যন্ত। কি ইংরিজি কি বাঙলা—কোনো ভাষাতেই তিনি ক্লিশে বা জারগন একেবারেই ব্যবহার করতেন না। তাঁর ইংরিজির ওপর নিঃসন্দেহেই গান্ধীর প্রভাব পড়েছিল। যে-কোনো পণ্ডিতের মতো তিনি শব্দপ্রয়োগে সচেতন ছিলেন। অর্থাৎ, একসের দিতে হলে তিনি একসেরের কিছু কম কিন্তু একেবারে খাঁটি দেবেন—এই ছিল তাঁর লক্ষ্য। একটা নমুনা দিই। মডারন বেঙ্গল-শীর্ষক আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতার শেষ অধ্যায়ে শ্রোতাদের বোঝাচ্ছেন বাঙালির জীবনে ধর্মচিন্তার লোকায়তকরণ কী করে সম্ভব হল : "দেয়ার হ্যাজ বীন এ কনসিডারেবল সেকিউলারাইজেশন অব ইনটারেসট্স ; অ্যানড রিলিজাস ফেসটিভ্যালস, হুইচ ওয়্যার ওয়ানস ইনফরমড বাই এ প্রমিস অব মিসটিক একসপীরিয়েনস, হ্যাভ নাউ বীকাম দ্য ভিহিকলস অব পপুলার অরগানাইজেশন, অব এনটারটেনমেনট গ্লোন ওপন টু দ্য মালটিচুড, টু হুম ইট ওয়জ অফন ডিসায়েড। অ্যানড মোটিভস অব আর্ট হ্যাভ টেকন দ্য গ্লেস হোয়্যার রিলিজাস মিসটিসিজম ফরমারলি রেইনড সুপ্রিম। দিজ ইজ পার্টিকুলারলি ট্রু অব দ্য শেপ ইনটু হুইচ কমিউনাল, রিলিজাস ফেসটিভিটিজ, কলড সার্বজনীন পূজা, আর বাঁয়িড রিকাসট ইন রিসেনট টাইমস।"

বাঙালি মানসের বিশ্লেষণ দিয়ে এই বক্তৃতা শেষ করছেন : "অ্যানড অ্যাজ দ্য বনডেজ অব দ্য পাসট স্টিল কনটিনিউজ টু ক্ল্যামপ পার্ট অব বেঙ্গলস লাইফ, দেয়ার আর ন্যাচারালি টেনডেনসিজ ইন পলিটিকস, সোস্যাল থট অর অ্যাকট ইন হুইচ দ্য থীম জ ডমিন্যানটলি ওয়ান অব রিভোলট রাদার দ্যান অব নিউ কনস্ট্রাকশন।" (মডারন বেঙ্গল, পৃ ১৫। বক্তৃতাকাল নভেম্বর—ডিসেমবর ১৯৫৭) এ ভাষা প্রাঞ্জল, বিষয় থেকে এতটুকু বিচ্যুত নয়। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, আমরা তাঁর বক্তব্য বুঝলাম। এ যদি বাঘা নৃবিজ্ঞানীর ভাষা না হয়ে থাকে নাই-বা হল।

এই সহজ স্বাভাবিক ইংরিজি নাকি সমাজবিজ্ঞানের বন্ধু নয়। কেন নয়? সে রহস্য আমি উন্মোচন করতে পারি নি। তবে নির্মলকুমারের ইংরিজি যারপরনাই বোধগম্য ছিল। এটা কারু কারু আপত্তিকর ঠেকতে পারে। এবং তিনি অসীম শক্তি আর সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন স্বল্প কথায়।

এই ইংরিজি প্রসঙ্গে একটা কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারা গেল না। ইংরিজি নিয়ে শিক্ষিত বাঙালির একটা অদ্ভুত দুর্বলতা আছে। উনবিংশ শতকে যা তাকে মানিয়েছিল তা যে তাকে আজও মানাবে, এটা ভাবতে অবাক লাগে। ইংরিজি ভাষা আমাদের শেখা (যাতে করে আমি পাশ্চাত্য ইতিহাস দর্শন সমাজবিজ্ঞান চর্চা করতে পারি। এবং আন্তর্জাতিক কাজকারবারে যোগ দিতে পারি) উচিত, এ বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাঙালি একজনের ইংরিজি নিয়ে ভয়ানক স্পর্শকাতর। এবং একজন ভালো ইংরিজি উচ্চারণ করলে (অর্থাৎ ভালো বলিয়ে-কইয়ে হলে) তার জজপ্রাপ্তি সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ রাখতে পারে না। সবিনয়ে নিবেদন করব, নির্মলকুমার যেমন অপূর্ব বলতেন তেমনি দুষ্প্রাপ্য তাঁর রচনা।

একটি ঘটনা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। সময় ১৯৬৪-৬৫। স্থান ভারতীয় নৃতত্ত্ব সমীক্ষা দপ্তর। ডিরেকটর নির্মলকুমার বসু চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ডিকটেশন দিচ্ছেন। কুঁজো হয়ে বসতে দেখে নি তাঁকে কেউ কোনোদিন। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন তাঁরই ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী প্রফেসর হুমায়ুন কবির। আমরা সবাই জানি, মাননীয় মন্ত্রী তাঁর কোনো ডিপার্টমেন্ট পরিদর্শনে এলে কী ঘটনা ঘটে। ডিরেকটর বসু মন্ত্রী-মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন : আরে, আসুন আসুন কবিরসাহেব। তারপরই আরম্ভ হয়ে গেল গেল বিভাগীয় কথাবার্তা। ইতিমধ্যে ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন মন্ত্রীমশায়ের। সেও অতি স্বচ্ছন্দে। আপনি প্রফেসর কবিরকে না চিনলে জানতেই পারতেন না যে কেন্দ্রের মন্ত্রী এসেছেন ইনডিয়ান মিউজিয়মে।

নির্মলকুমারের অপর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি কৃষ্ণ কৃপালিনী, সত্যেন বসু, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, রমেশ মজুমদার প্রমুখদের সঙ্গে যেমন আড্ডা দিতে পারতেন তেমনি পারতেন একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে বসে যেতে ঘন্টার পর ঘন্টা। এবং ওই সঙ্গে সহ্যব্যবহার করে যেতে পারতেন মুড়ি বা হাম স্যানডুইচ বা কাঁচাগোল্লা নির্দ্বিধায়।

নতুন দিল্লির পান্ডারা রোডের (ইনডিয়া গেটের কাছে) বাসভবন থেকে গল্প করতে-করতে সকালে তিনি ১১ ক্যানিঙ লেনে (অর্থাৎ কারজন রোড-সিন্ধি হাউসের কাছে) চলে এলেন। গল্প যার সঙ্গে করছেন তিনি তখন ভাবছেন এ কী বিপদ হল সাতসকালে। কিন্তু আর কোনো উপায় নেই। ক্যানিঙ লেনে পৌঁছে একগ্লাস দুধ তাঁর বরাদ্দ। ওই সঙ্গে উত্তরভারতের জিলিপি হলে মন্দ হয় না। কিছুক্ষণ একেবারেই গল্পের মেজাজ। আজীবনের শ্রদ্ধেয় নির্মলদার সঙ্গে ব্যস্ত অতুল্য ঘোষ আড্ডায় বসে গেলেন। অতুল্য ঘোষ তখন পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রধানদের অন্যতম। সে রাজনীতির পরিচয় ক্যানিঙ লেনে তখন হারিয়ে যেত। বড়ো হয়ে উঠত সারা জীবনের বন্ধুত্ব। এইসব আসরে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যা বলার মতো। ১১ ক্যানিঙ লেনের কোনো আচরণে মনে হত না যে আমি পশ্চিমবঙ্গের কোনো ঘরে বসে নেই। এটা একটা অ্যাকসিডেনট যে ১১ ক্যানিঙ লেন নতুন দিল্লিতে অবস্থিত। সেই বাঙালি বাড়ির আদর-আপ্যায়ন, সেই খাদ্য, সেই শ্রীরামপুর থেকে পাঠানো ঝোলা গুড়। আবার পানজাবতামিলনাদের বা উত্তরপ্রদেশের ভিআইপি এলে তাঁরাও মিশে যেতেন এই বাড়ির আবহাওয়ায়। অতুল্য ঘোষ বক্তৃতা দিয়ে জাতীয় সংহতি করতেন না। আজও করেন না। নির্মলকুমার, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ সেকালে একটা বিচিত্র বাঙালি (এবং ভারতীয় তো বটেই) পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

এই তিনজনের নাম করলুম। এঁদের সংসারে আরো অনেক বাসিন্দা ছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এঁরা দুজনই নির্মলকুমারের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তাঁর রোগশয্যার পাশে প্রতিদিন দুপুরে বিশেষ করে দেখা যাবেই অতুল্য ঘোষকে। তাঁকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তবে নির্মলদা ভালো করে খাবেন। এ এক বিরল মধুর বন্ধুত্ব দেখেছি। দিনের পর দিন। নিজের কাজে প্রায়ই আরামবাগে যেতে হত প্রফুল্ল সেনকে। তাঁর মধ্যে সময় করে বন্ধুকে দেখে যাওয়া একটা নিত্য ব্যাপার ছিল। আমি এঁদের রাজনীতি কোনোদিন বুঝি নি। তবে নিশ্চয়ই বুঝেছি এঁদের সমাজনীতি খুব উন্নত মানের। মানুষকে এঁরা সর্বদাই সর্বাগ্রে মূল্য দিয়েছেন। রাজনীতির রঙ দেখে আমার আপনার বিচার এঁরা করেন নি। মানুষ হিসেবে মানুষকে গ্রহণ করার শিক্ষা, প্রবণতা আর মেজাজ এঁদের স্বভাব পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। একথা বলতেই হবে, এঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ জীবনধারা—সবকিছুর ওপরই গান্ধীর প্রভাব এত গভীর যে এঁদের যাঁরা ভালো করে দেখেছেন তাঁরাই আমার বক্তব্য বুঝতে পারবেন।

নির্মলকুমারের জীবনের অনেকখানিই যে গান্ধী নিয়ে নিয়েছিলেন, এ কথা বলাই বাহুল্য। এবং তিনিই গান্ধীর জীবনদর্শনের যথার্থ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। যাঁরা গান্ধী এবং গান্ধীবাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু, তাঁরা নির্মলকুমারের 'স্টাডিজ ইন গান্ধীজম' আর 'সিলেকশনস ফ্রম গান্ধী' পড়লে বিশেষ উপকৃত হবেন। প্রথম বইটিতে তিনি গান্ধীর সত্যাগ্রহের দর্শন, যুক্তি আর বিজ্ঞান উপস্থাপন করেছেন। স্বাধীনতা-সংগ্রামী গান্ধীর কর্মপদ্ধতির সংক্ষিপ্ত অথচ মৌলিক বিশ্লেষণ করেছেন। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে নির্মলকুমার উদারমনা, আত্মসচেতন আর বিবেকী মানুষ ছিলেন। তার প্রমাণ 'স্টাডিজ ইন গান্ধীজম' গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ : "কনফ্লিক্ট অ্যানড ইটস রেজোলিউশন ইন হিন্দু সিভিলাইজেশন"

(পৃ ৬১-১১৫)। এই প্রবন্ধটি তিনি আমেরিকার কোনো একটি আলোচনাচক্রে পড়েছিলেন—যদিও তিনি কোনোদিন পেপার পড়তেন না, পেপার প্রেজেন্ট করতেন। হাতের ঘড়ির দিকে নজর রেখে সাধারণত এক ঘন্টার বেশি সময় কোনোমতেই নিতেন না। এই বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় : হিন্দু ধর্ম আর সমাজ দুটো ভিন্ন-ভিন্ন ভূমিকা পালন করত। সমাজের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল আর ব্যক্তির মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য রক্ষা করে চলা। হিন্দুদের একটা বড়ো প্রতিভা ছিল—যেমন করেই হোক সংঘর্ষ এড়িয়ে চলা। আবিষ্কার করতে হবে—কোথায় কোথায় পাঁচজনের মিলিত চেষ্টায় একটা বড়ো সামাজিক মঙ্গল সাধন করা যায়। কোথায় পাঁচজনের মধ্যে কোন্ একটা গুণ বড়ো হয়ে উঠেছে—সেই গুণটাকেই বড়ো করে তোলা। আর, পাঁচজনের মধ্যে যেসব গরমিল আছে, সেগুলোকে বড়ো করে না তোলা। প্রাচীন ভারতবর্ষের পঞ্চায়েত এই বিশ্বাসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চ হল পাঁচ, এবং পরমেশ্বর অর্থাৎ ভগবান। তাই হল পঞ্চ-পরমেশ্বর, অর্থাৎ পাঁচজনের পরিষদ। এই পঞ্চমের একটা প্রাচীন ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। পঞ্চ বস্তুতে পৃথিবী নির্মিত ; পঞ্চেন্দ্রিয় মানুষের পরম সম্পদ। অতএব, "দ্য ম্যাজিক ফিগার ফাইভ রেপ্রেজেনটস 'হোলনেস'।" ঐতিহাসিক-নৃতত্ত্ববিদ হিসেবে নির্মলকুমার এসব বিচার করেছেন।

এইসব বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা তিনি পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে রেখে গেছেন। এই পারমাণবিক অস্ত্র আর পোলিটিক্যাল কালচারের যুগে নির্মলকুমারের এই প্রবন্ধের পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন হতে পারে। আজ আমরা ঘোরতর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রকোপে পড়ে এমন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, এমন ভিন্নতা, এমন আত্মমগ্নতাকে বড়ো করে তুলেছি যে আধুনিক মানুষ প্রতিদিন বিপন্ন বোধ করছে। আজ সে স্নায়ুতন্ত্রে এক অবশ-করা বেদনাবোধে জর্জরিত। তার ব্যক্তিত্ব ছিন্নভিন্ন। এই ফাঁকে সোচ্চার হয়ে উঠছে ধর্মতান্ত্রিকের দল। আজ আমেরিকায় ইউরোপে ধর্ম ফিরে আসছে নক্ষত্রবেগে। কারণ, তরুণসমাজ পণ্ডিতসমাজ এই শুদ্ধসাত্ত্বিক-যান্ত্রিক সভ্যতা চায় নি। তারা চেয়েছিল (আজও চায়) উইজডম। চায় নি কেবল প্রযুক্তিবিদ্যা আর ইনফরমেশন—কেবল ইনফরমেশন। বিজ্ঞান যে জ্ঞান দেয় তা আমরা চেয়েছিলাম। কিন্তু বিজ্ঞান এক ভয়াবহ প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা করে চলেছে। যার ফল এই পৃথিবী স্টার-ওয়ারসের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হতে চলেছে। স্বভাবতই গান্ধীশিষ্য নির্মলকুমার এই ভবিষ্যৎকে দুঃস্বপ্ন বলেই অভিহিত করে গেছেন। এই প্রসঙ্গে নির্মলকুমার গান্ধীর একটি সুন্দর কথা প্রায়ই উচ্চারণ করতেন : "আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ভবিষ্যতে সভ্য পৃথিবী চার আনার জমিদারি রাখতে বারো আনার লেঠেল নিযুক্ত করবে।"

গান্ধীর নির্দেশিত পথেই নির্মলকুমার অহিংসা পরম ধর্ম বলতেন না। বলতেন, অহিংসা একটি ব্যবহারিক সামাজিক আচরণ। যুদ্ধের একটি বিকল্প পজিটিভ ব্যবস্থা। তাই কোনোপ্রকার অন্যায় অপরাধ বা অবিচারের জবাব বা নিষ্পত্তি হিংসা দিয়ে হবে না, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

নির্মলকুমার প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস অনেক ইতিহাসকারের চেয়ে বেশি ভালো বুঝতেন। কারণ তিনি ছিলেন একাধারে ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ আর ভৌগোলিক। স্বরাজের চিন্তা, দেশের দারিদ্র্যের সমস্যা, স্বাধীনতার পরে জাতীয় সংহতির সমস্যা—এইসব তাঁকে সব সময়ে চিন্তান্বিত করে রাখত। তাঁর 'প্রবলেমস অব ন্যাশনাল ইনটিগ্রেশন' (সায়েনস অ্যানড কালচার, খণ্ড ৩০, এপ্রিল ১৯৬৪, পৃ ১৫৭-১৬০) রচনাটি গুজরাত, আসাম, পানজাব আর কাশ্মীরের সমস্যা বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

তাঁর নিরলস কর্মময় জীবনের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, তিনি যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, রিয়ালিটি ইজ ইনকারনেট ইন পীপল রাদার দ্যান ইন আইডিয়াজ। তিনি বিশ্বাস করতেন, কঠিন বিচার-বিশ্লেষণই মানবজীবনের সবটা নয়। তাঁর জীবনধারা প্রমাণ করে যে ইনটুইশন আর ইনসাইট দিয়েই রাজন-নামক মহৌষধ প্রস্তুত হয়। কেবল বুদ্ধিবাদ (র‍্যাশনালিজম) দিয়েই মানুষের জীবন চালিত হয় না। মানবিক যুক্তিশীলতা প্রখর বুদ্ধিবাদের চেয়ে ঢের বেশি মূল্যবান। নির্মলকুমার তাঁর জীবনে এর প্রমাণ রেখে গেছেন।

পোকামাকড়ের ঘরবসতি

সেলিনা হোসেন

জুলেখার সঙ্গে প্রাথমিক মন-দেওয়া-নেওয়া শেষ হয়েছে কবেই, এখন সালেক চায় শরীর। শুধু কথায় কি মন ভরে? ঠিক যেন জমে ওঠে না, বাঁধন আলগা মনে হয়। মালেক সমুদ্রে গেছে। আলেককে ও নিজেই পাঁচটা টাকা হাতে দিয়ে নোয়াবের জাঁপে তুলে দিয়েছে টেকনাফ বেড়িয়ে আসার জন্যে। এখনই সুযোগ। জুলেখা রাজি হলেই হয়। অন্ধ মাকে সালেক ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না—বুড়ি থাকলেই বা কী, না-থাকলেই বা কী? মালেকের দিকে মায়ের পক্ষপাত আছে, এটা ও টের পায় এবং সেজন্যেই বুকে ঈর্ষা। সালেক কিছু বলে না, কিন্তু মাকে আমল না দিয়ে বুকের জ্বালা জুড়োয়। গতকাল জুলেখার সঙ্গে কথা হয়েছে—ও সন্ধ্যার দিকে আসবে। ঘরেই থাকবে সালেক। দুপুরের পর থেকে ওর অস্থির লাগে। এর আগে কোনো মেয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক হয় নি। জুলেখাই প্রথম।

—ও বাবা, সালেক!

—কও।

—ভাত ন দিবি দুগা?

এতক্ষণে ওর চমক ভাঙে। তাই তো, মাকে ভাত দেওয়া হয় নি! খারাপ লাগে। আজ ওর মন খুশি, তাই মা-র ওপর রাগ কম। তাড়াতাড়ি শানকিতে ভাত বাড়ে।

—খ, মা।

—তুই ন খাবি?

—খাইয়াম।

মিথ্যে বলে চোঁক গেলে। মাকে রেখে খেয়ে ফেলেছে—এই অপরাধবোধের যাতনা কাটাতে পারছে না।

—সালুন ভালা হইয়ে, না রে?

—আই রান্দি, মা।

—ক্যা, আদুর মা ন আইয়ে?

—হিতার জ্বর হইয়ে।

—তুই তো ভালা রাইনতে শিখাস।

—কাজত গ্যালে রান্ধি খওন লাগে যে।

মা চুপচাপ খায়, বেশ তৃপ্তি নিয়ে। সালেক দেখে, টুকটাক কথা বলে। ওর ভালোই লাগে। এক সময় বুড়ি হাত গুটিয়ে বলে, মালেক যে অন কী করের?

—তুই হুদা মাইজ্যা ভাইয়র কতা কও ক্যা?

বুড়ি চুপ করে থাকে। সালেক মা-র মনোভাব বুঝে আর কথা বাড়ায় না।

—অ মা, ইবা আবার ক্যা কতা? পোয়াডা সাগরত গিয়ে—

—হ, সাগরত আঁইও যাই। কই, আঁর কতা তো ন কও।

—গোস্যা কর ক্যা?

—গোস্যা ন হইয়্যাম না? তুঁই মাইজ্যা ভাইরে বেশি ভালোবাস। কথাটা বলে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসে। আজ ও মেজাজ খারাপ করবে না। আজ জুলেখা আসবে ওর কাছে। ও মাকে পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়, ভাতের শানকি ধুয়ে গুছিয়ে রাখে।

—মা, তুঁই গুমাইবা?

—না, ঘুম তো ন আইয়ের।

—ফুতি থাকো।

সালেক মাকে বিছানা করে দেয়। বুড়ি অবাক হয় —বড়ো বেশি লক্ষ্মী ছেলের মতো আচরণ করছে সালেক। কিন্তু মুখে কিছু বলে না, কাঁথা গায়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ঘুম আসে না, বার-বার মালেকের কথা মনে হয়। কারো কথা মনে হলেই কান্না আসে। কাঁদতে-কাঁদতেই বুঝি চোখ দুটি গেল।

বিকেল পড়ে গেলে জুলেখা আসে। তখনো ফিকে আলো চারদিকে, পুরো আঁধার নামে নি—আলো-আঁধারি ছায়া। সালেক ওর হাত ধরে।

—মনত হয় কত দিন ধরি তোঁয়ার লাই বই আছি।

জুলেখা ঠোঁট টিপে হাসে।

—অ সালেক, কন আইস্যে রে?

—জুলেখা, মা।

—কী কর?

—অ্যানে আইস্যে। যাইব গই অন।

—ডর মাইয়া, সইন্ধার আগেই য্যান যায় গই।

—তুঁই ঘুম।

গলায় ঈষৎ ঝাঁঝ, সালেক বিরক্তি প্রকাশ করে। বুড়ি ওর গলার ঝাঁঝে ব্যাপারটা বুঝে ফেলে, রাগ হলেও কিছু বলতে পারে না।

ওরা দুজনে ঘরের কোণে মাদুর বিছিয়ে বসে। বড়ো নিরিবিলি শীতল মনে হয় জায়গাটা। ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ওরা। জগৎটা এখন ওদের একলার, সেই আদম-হাওয়ার কালের। তখনো পাখি ডাকে নি, নদী বয় নি, গাছ জন্মায় নি। সালেক জুলেখার ঠোঁটে ঠোঁট রাখে। বড়ো ভালো মেয়ে জুলেখা—নিবিড় করে কাছে টানে। ভয় পায় না, সংকোচে কুঁকড়ে থাকে না, আদমকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে আসে।

সন্ধ্যা উতরে গেলে সালেক ওকে এগিয়ে দেয়।

—আবার কঁত্তে আইবা?

—তুঁই য্যাহেত্তে কইবা।

—ঠিক আছে, দিনক্ষণ দেইয়ারে তোঁয়ারে কইয়্যাম। আজুয়া বড়ো ভালা লাগিল, জুলেখা।

—আঁরও। জুলেখা ঠোঁট টিপে হাসে, হাসিতে মানিক ঝরে—মুহূর্তে সালেকের তাই মনে হয়। পাকুড়-গাছের নীচে এসে ও থমকে দাঁড়ায়।

—আর আইয়ন ন লাইব।

দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যায় জুলেখা। মাসুদের ঘরের আড়ালে অদৃশ্য হলে ওকে আর দেখা যায় না। সালেক শিশ বাজাতে-বাজাতে ঘরে ফেরে। ঝাঁপ খুলে ঢুকতেই ওর মার খনখনে কণ্ঠ অন্যরকম মনে হয় :

—সালেক না?

—হ, মা।

—মাইয়াডা গিয়ে না?

সালেক চুপ। কণ্ঠ আড়ষ্ট।

—কামউয়া ভালা ন হয়।

—বেশি কতা ন কইয়্য। তুঁই কী খাইবা কও। আঁই অন ভাত রাইন্দ্যাম।

—উপরে আল্লা আছে, রে!

বুড়ি বড়ো করে শ্বাস ফেলে। সালেকের রাগ হয়।

—বেশি ক্যাচর-ক্যাচর ন কইরগ্য। তাইলে আঁই বাড়ি ছাড়ি যাইয়্যাম গই।

ওর চিত্তে এখন হাজার অনুভূতির বুদ্বুদ। সেগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে কখনো শিহরিত হয়, কখনো আপন মনে হাসে—জুলেখা শয়তান, তোর মধ্যে এত! মাগো, কত যে পারিস।

ও চুলোয় ভাত বসায়, আলু সেদ্ধ করে। নিজের ট্যাঁক ঝেড়েঝুড়ে পাঁচটা টাকা পায়। আজ মাকে একটা ডিম খেতে দেবে—মা কত দিন যে ডিম খায় না! ভাতের মাড় গালিয়ে রেখে ও সিকান্দারের দোকানে ডিম কিনতে যায়। ওর এখন কত কিছু করতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। কী করা যায়! কী করলে নিজেকে হাওয়ার মধ্যে ভাসিয়ে দিতে পারে!

বেশ চড়া দামেই হাবিবের কাছে মুক্তো বিক্রি করে সাফিয়া। একসঙ্গে অনেকগুলো টাকা। জয়গুনের তো চক্ষু ছানাবড়া। সাফিয়া হাসতে-হাসতে মাকে জড়িয়ে ধরে :

—অ মা, টেঁয়াগুন ব্যাক বাঁশর চোঙ্গাত বাঁধি লুকাই রাখো।

—মালেক যদি জানিত পারে?

—রাখি দ ইতার কতা। খাডিয়ারে কউয়া মুক্তা আলগা করি হুদা রাখ্যিলাম। অ্যাঁতে কী হয়?

জয়গুন একমুহূর্ত ভাবে।

—কামডা ঠিক হৈল না।

—তুঁই যে কী কও মা, ন বুজি। অ্যাত ভাবিলে চলে না। আঁরার প্যাটত ভাত নাই, ধান্দা করি ভাত জোগাড় করন লাগে।

—ঠিক কইয়্যস। জয়গুন নিজের মনের মধ্যে জোর খুঁজে পায়।

—এই টেঁয়াউন জমা করো। ইয়ুন দি আঁরা দালান তুইল্যম। এই জাইল্যাপাড়ার বেগুন্যনত্তুন সোন্দর দালান।

—হাছা? জয়গুনের দৃষ্টি চকচক করে। কোনো দিন দালানকোডাত ন থাকি।

—ক্যা, তুঁই দালানত কাম ন কর?

—হ, তোর য্যাঁ কতা। পরর দালানত কাম করি কি সুখ আছে না?

—অ মা, ঠিক কইয়্য। তুঁই দেইকখো, আঁই ঠিক-ঠিক দালানের টেঁয়া জোগাড় কইরগ্যম। সাফিয়া মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে আদুরে ভঙ্গিতে। কখনো বেশি আনন্দে এমন ছোটো হয়ে যেতে ইচ্ছে করে। আসলে অনাগত স্বপ্ন দুজনকে এক অবস্থানে এনে দাঁড় করায়। এখন আর বয়সের পার্থক্য নেই, সম্পর্কের হেরফের নেই —দুজনে এক এবং অভিন্ন। বড়ো কাছাকাছি, পরস্পরে নির্ভরশীল।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ঘরে বাতি জ্বালানোর জন্যে জয়গুন উঠে যায়। সাফিয়া মাদুর পেতে শুয়ে থাকে। গতকাল থেকে নজীর মিয়ার বাড়িতে পানি-টানার কাজ শুরু হয়েছে। শরীরে ব্যথা। দু-চার দিন না গেলে ঠিক হবে না। তবু এ ধরনের কাজই ওর ভালো লাগে। যখন যা করতে মন চায়। এক ধরনের কাজ ওর ভালো লাগে না। মুক্তো খোলা, শুটকি বানানো, পানি টানা, বর্ষার মৌসুমে গোরুর জন্যে ঘাস কাটা—এইরকম কাজ। বৃষ্টিতে ভিজে ঘাস কাটতে ও আনন্দ পায়। শুটকির জন্যে কচমচিয়ে মাছ কাটাও চমৎকার। মন ভালো থাকলে কোনো কাজে অসুবিধে নেই। ইদানীং শুকুরের সঙ্গে প্রেম ওকে চমৎকার সুখ দেয়। সময় তরতরিয়ে বয়ে যায়। লোকটা একটু বেশি ন্যাস্পি খায়—ওটাই খারাপ লাগে। উৎকট গন্ধ নাকে সয় না। চুমু খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে নাড়িভুঁড়ি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। ওর অনু-রোধে ওর কাছে এলে ন্যাস্পি খায় না, কিন্তু মাঝে-মাঝে মানে না।

জয়গুন উঠোনের চুলোয় ভাত বসিয়েছে। নিজের জন্যে একথালা ভাত তোরাব আলীর বাড়ি থেকে আনে, কিন্তু সাফিয়ারটা রাঁধতে হয়। শুকনোর দিনে সে উঠোনে চুলো পাতে, শুকনো পাতায় রাঁধে। হাতে অন্য কাজ না থাকলে সাফিয়া বস্তা ভরে ঝরাপাতা কুড়িয়ে আনে। যেদিন তোরাব আলীর বউ কিছু বেশি ভাত দেয় সেদিন রাঁধতে হয় না, নইলে চুলোর ধারে বসে শুকনো পাতা গুঁজে ভাত রাঁধতে পছন্দই করে জয়গুন।

সাফিয়া বারান্দায় শুয়ে আগুনের শিখা দেখে। শরীরের ব্যথা ওকে কাবু করে রাখে। মালেক এখন হাঙর ধরার নেশায়—বোকা লোকটা টেরই পেল না ওর ভাগ থেকে কত মুক্তো সরে গেল। ও ঠোঁট বাঁকায়—বেশি ভালোমানুষি করলে ওঠা যায় না, তাই ছলচাতুরী চাই। এটাই এখন বেঁচে থাকার অবলম্বন। শুধু শারীরিক শ্রম কতটুকুই বা এগিয়ে দেয়। বাপদাদার আমলের ধ্যানধারণা নিয়ে বসে থাকলে এখন কিছুতেই বাঁচা যাবে না। মালেক এসব পছন্দ করে না। বলে, শুধু একজন্যের জন্যে এত ছলচাতুরীতে কী লাভ। বরং সবার মঙ্গল করা দরকার। যত্ত সব বাজে চালাকি—দাতা মানুষ হবার বাসনা হয়েছে। সাফিয়া শব্দ করে হেসে ওঠে। ভোটের সময় কত বার কত লোকের বড়ো-বড়ো কথা শুনেছে। দেখা আছে কে কোন্ কলাটা করেছে। ভোটের পর আর পাত্তা মেলে না। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে যায়। যত্ত সব!—সাফিয়া বিড়বিড় করে অনুপস্থিত মালেককে গাল দিয়ে ভুরু কোঁচকায়।

ঝাঁপ খুলে নিঃশব্দে শুকুর ঢোকে। ন্যাপ্পি খেয়ে টালমাটাল অবস্থা। জুয়ার আসরে গন্ধা দিয়ে মেজাজ খারাপ। চুলোর কাছে তার দীর্ঘ ছায়া পড়তেই জয়গুন মুখ ফেরায়।

—কনে?

শুকুর জবাব না দিয়ে জয়গুনকে উপেক্ষা করে বারান্দায় উঠে আসে। এই লোকটাকে জয়গুন একদম পছন্দ করে না। সাফিয়াকেও সরাসরি কিছু বলতে পারে না—নাঁরবে সহ্য করে। জয়গুন মুখ না ফিরিয়েই টের পেল যে দুজনেই ঘরে ঢুকল।

—মাল টানি আইস্যো না?

—হ।

—আরে বমি আইয়ের।

—বেশি কতা কইলে গলা টিপি মারি ফালাইয়াম।

সাফিয়া বিশ্মিত হয়। বুঝতে পারে শুকুরের নেশা জমজমাট। মা-র উপস্থিতি ওকে বিব্রত করে। কখনো মা-র সামনে ওর সঙ্গে মিলিত হয় নি। জয়গুন ঘরে না থাকলেই শুকুর আসে। আজ ওকে বিরাটাকার দৈত্যের মতো দেখাচ্ছে, হিংস্র এবং কদাকার। শুকুর সাফিয়ার হাত চেপে ধরে।

—ছাড়ি দাও, মা ঘরত।

—ছাড়ি দেওনের লাই ন আই।

শুকুর ওকে জড়িয়ে ধরে, মুখের ওপর ঘন নিঃশ্বাস উৎকটগন্ধভরা। সাফিয়া জোর খাটায়।

—ছাড়ি দাও, শরীল ভালা ন।

—না।

শুকুরের দুহাত সাঁড়াশি—দাঁতঅলা আর লোহার মতো শক্ত। ওর পুরু মোটা ঠোঁটজোড়া পাথর হয়ে সাফিয়াকে থেঁতলে দেয়, এবং খুব দ্রুত ক্রুদ্ধ আর ব্যথিত করে ফেলে। এই প্রথম ওর নিজের ওপর ঘেন্না হয়, নিদারুণ ঘৃণায় চোখ ফেটে জল আসে। বারবার মালেকের মুখ ভেসে ওঠে—নম্র এবং বিনয়ী। ওর লাজুক হাসির বিনীত ভঙ্গিতে মুহূর্তে ওকে শুকুরের চাইতে অনেক বড়ো এবং বিশাল মাপের মনে হয়। কিন্তু আর সময় নেই, জল অনেক গড়িয়েছে, ও এখন পুরোপুরি শুকুরের হাতের মুঠোয়।

মাতালটা এক সময় নরম, ভালোমানুষি ভঙ্গিতে ওর পিঠে হাত রাখে—রাগ করর না!

সাফিয়া কথা বলে না।

—আই তোঁয়ারে আর জোরাজুরি ন কইরগাম। এই কান ধরি কইলাম। মাতালটা দু হাতে নিজের কান মলে।

সাফিয়ার রাগ বাড়তে থাকে—তুই অন য।

—আরে ভাগাই দর না?

—হ।

—ক্যা? ভাগাইবা ক্যা? আই ন যাইয়াম। চাই কোন্ বাপর বেডা আরে ভাগাইত পারে। এই আই গ্যাট হই বইলাম।

সাফিয়ার বুক ফেটে কান্না আসে। ও ফুঁপিয়ে ওঠে। শুকুর বিমূঢ় হয়ে যায়।

—কান্দো ক্যা। ন কাইন্দো। আগামী হপ্তায় আঁরার বিয়া সারি ফালাইয়াম। আই তোঁয়ারে বিয়ার কতাই কইবার লাই আসিলাম, কিন্তু মাথাটা ক্যা জানি হই গ্যালো। মনত হৈল তুই আঁর বউ, জনমর জনমর বউ। আই কতা কইলে তুই না করিবা ক্যা?

সাফিয়ার ফোঁপানি কমে আসে। এই মাতালের কাছে ওর ঘৃণা আর কান্নার কোনো মূল্য নেই। ও সেটা বুঝবেও না। নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপচাপ বসে থাকে। মা-র জন্যে খারাপ লাগে। ও জানে ওর মা শুকুরকে পছন্দ করে না। কিন্তু মাকে ও তেমন আমল দেয় নি—নিজের মতামতকেই চূড়ান্ত ভেবেছিল। ওর বারবার মনে হয়, মা-র চুলোর আগুন কি নিভে গেছে? ভাতের মাড় গেলেছে কি? উঠানে আর আগুনের শিখা কাঁপে না। মা নিশ্চয় হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে আছে—অসহায় এবং আক্রোশহীন।

—বিয়ার সমত তোঁয়ারে কী দিয়ম কও তো?

—কিছু ন।

—তুই আইজও গোস্যা করি রইয়া। এই কান ধরি কইলাম আর কোনোদিন ন্যাপ্পি ন খাইয়াম, জুয়া ন খেইলাম, গুন্ডামি ন কইরগাম। তুই যা কইবা ব্যাক হুইনাম। ঠিকঠাকমতো দোয়ান চালাইয়াম। দেইবা আই একবারে ভালো মানুষ হই যাইয়াম।

বলতে-বলতে ও মাদুরের ওপর চিতপাত শুয়ে পড়ে। একটু পরে ওর নাক ডাকতে শুরু করলে সাফিয়া অসীম বিরক্তিতে বারান্দায় বেরিয়ে আসে। ও দেখল, ও ঠিক যেমন ভেবেছিল ঠিক সেভাবেই মা বসে আছে। শুধু দেখতে পেল না মার চোখে জল।

উঠোনে ছায়া নেই। অন্ধকার গাঢ় এবং ভুতুড়ে। মাতালটা আজ রাতে এখানেই থাকবে—ওকে নাড়ানো মুশকিল। সাফিয়া খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে। ওরা মা-মেয়ে মিলে বাড়িটাকে বড়ো বেশি ঝকঝকে তকতকে রাখে। সারা দিন খেটে এলেও নিজেদের ঘর-টুকু পরিষ্কার না রাখলে ওরা স্বস্তি পায় না।

জয়গুন হাঁটুর ওপর চোখ মোছে। মালসা থেকে ভাতের হাঁড়ি উঠিয়ে জোরে ঝাঁকিয়ে নেয়। পাতার আগুন বলে তাড়াতাড়ি নিভে ছাই হয়ে যায়। কাঠ হলে কয়লা হয়—অনেক ক্ষণ গনগন করে। উঠতে গেলে জয়গুনের কোমরে টান লাগে। ইদানীং এমন হচ্ছে। বয়সের কামড়। মাঝে-মাঝে সাফিয়া তুষের আগুনে ন্যাকড়া গরম করে সেঁক দিয়ে দেয়। বড়ো আরাম লাগে।

—হাঁড়িডা তুই রাখ, আঁই আইনাম।

সাফিয়া কাছে এসে দাঁড়ায়। জয়গুন খুব নরম কণ্ঠে বলে, ভাত ন খাবি, খুদা ন লাগে?

—লাইগ্যো, মাগো।

সাফিয়ার বুক ফেটে কান্না আসে। ছেলেবেলার মতো মা-র গলা ধরে যদি আকুল হয়ে কাঁদতে পারত? এখন তো আর যখন-তখন মা-র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না। কেন যায় না? মা-র বুক তো ওর জন্যে খোলাই আছে। ও নিজেই কি দূরত্ব বাড়িয়েছে?

জয়গুন বারান্দায় উঠে গেছে। পিঁড়ি পেতে, বাসন ধুয়ে খাওয়ার আয়োজন করছে। ও শ্লথ পায়ে কুয়োর পাড়ে আসে। বালতি থেকে পানি নিয়ে মুখে ঝাপটা দিতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে। সেই ঘটনার পর থেকেই বুক একদম খালি হয়ে গেছে। কেবলই মনে হয়, ওর কোনো কাছের মানুষ নেই।

—ও সাফিয়া-মা রে!

আবার সেই কণ্ঠ। নাম নদীর বাতাস হয়ে ছুটে আসছে—স্নিগ্ধ, সুশীতল। মা কী করে টের পায় যে আমার কোনো আশ্রয় নেই, আমার এখন আশ্রয় দরকার। আমার পেটের খিদে মেটায় মা, মনের খিদে মেটায় মা। ও নিজের মনের পৃষ্ঠা ওলটপালট করে। মা ঠিকমতো বুঝে যায় ওর কী দরকার। ওর কান্না থেমে যায়। হাতমুখ ধুয়ে উঠে আসে। জয়গুন শানকি ভরে ভাত দিয়েছে ওকে—অনেক ভাত। সঙ্গে তোরাব আলীর বাড়ি থেকে আনা তরকারি, আলু-পটোলের ভাজি আর শুটকির ভরতা। জয়গুন ওকে প্রায় সবটাই উঠিয়ে দেয়।

—তুই এই একানাই রাখিলা, মা?

—আই আর কাঁদিন? তোর অন খওন দরকার। নইলে শরীল ঠিক থাইব ক্যানে?

—তোঁয়ার শরীল?

—আঁর আবার শরীল কী? এই আছি, এই নাই।

—তুই ন খাইলে আঁর আর কন আছে?

সাফিয়ার ভাত খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চোখ গোল করে মা-র দিকে তাকায়। বয়সের ভারে ক্লান্ত, কোঁচকানো চামড়া ফাটা-ফাটা, ধ্বসের চাউনিতে একটা জীবন-পাড়ির বেদনা। ও অভিভূত হয়ে যায়। জয়গুন একগ্রাস চিবিয়ে বলে, তোর বাপ মরি গিয়ে বলে আঁরা কি বাঁচি নাই, মা?

—না, না, তুই মরিত ন পারিবা। সাফিয়া প্রবলভাবে মাথা নেড়ে দ্রুতকণ্ঠে বলে। জয়গুনের ভাঙা গালে হাসি ছড়িয়ে যায়।

—অন খ। অ্যাত ভাবিয়ারে লাভ কী?

—হ ঠিক। বহুত রাইত হইয়ে। বেয়ানে তোঁয়ার আবার কামত যন পড়িব।

দুজনে চুপচাপ খায়। সামান্য তরকারির সঙ্গে বাড়তি মরিচ ডলেও ভাত ফুরোয় না। সাফিয়া বাসনের বাকি ভাতে পানি ঢেলে দেয়। সকালে খাবে। জয়গুন আগেই উঠে পড়েছে। বাসনকোসন গুছিয়ে রাখছে এক কোণে। সাফিয়া পানি খেতে গিয়ে থেমে যায়—মা ঘুমুবে কোথায়? মাতালটার নাকডাকা প্রবল হয়েছে। লজ্জায়, সংকোচে ও বিব্রত বোধ করে। মা ওকে এ নিয়ে একটা কথাও বলে নি। বিরক্তি প্রকাশ করে নি। আশ্চর্যজনক-ভাবে নীরব।

জয়গুন বারান্দার কোণে মাদুর পেতে বিছানা করে—আয়, ফুতি পড়।

জয়গুন শুয়ে পড়ে। সাফিয়া ঢকঢকিয়ে পানি খায়। কৃতজ্ঞতায় বুক ওর ভরে ওঠে। মাতালটার লজ্জা থেকে মা ওকে আড়াল করে দিয়েছে। কুপি নিভিয়ে মায়ের পাশে শুয়ে পড়ে ও। আলোটা যেন এতক্ষণ একটা শব্দ ছিল। সেটা নেভানোর সঙ্গে-সঙ্গে চারদিক নিঝুম হয়ে যায়। সহজে ওর ঘুম আসে না। চারদিক তোলপাড় করে শুকুরের নাকডাকার শব্দ ওঠে, যেন সমুদ্রের গর্জন। প্রবল বেগে সে গর্জন সাফিয়ার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ও প্রাণপণে ঘুমুনোর চেষ্টা করে।

পরদিন শুকুরের ঘুমভাঙার আগেই জয়গুন কাজে চলে যায়। সাধারণত এত ভোরে বেরোয় না। তখনো সাফিয়ার ঘুম ভাঙে নি। দিনের আলোয় ওদের মুখোমুখি হতে চায় না জয়গুন। জীবনের দীর্ঘ পাড়ি তো হয়েই গেল, এখন আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। পরিশ্রম করার ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবার আগেই মরতে হবে। জয়গুনের বুক খালি হয়ে থাকে। মেয়েটার সুখ হল না। আর হবে কিনা জানে না ও। ঘুরেফিরে মালেকের মুখ মনে পড়ে—এই জেলেপাড়ায় ও একটা মানুষের মতো মানুষ, ওর মতো আর একজনও নেই। জয়গুন সবার কাছে এই কথা বলে। জোয়ানরা হেসে উড়িয়ে দেয়, বুড়োরা সায় দিয়ে মাথা নাড়ে। জয়গুন নিজের বিশ্বাসে অনড় থাকে।

ও তোরাব আলীর বাড়িতে পৌঁছে গেলে সাফিয়ার ঘুম ভাঙে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসে—মা কখন গেল? ঘরের ভেতর তাকায়। শুকুর ঘাড় গুঁজে গুটিশুটি শুয়ে আছে। সাফিয়া হাই তোলে, হাতে পেঁচিয়ে চুলের গোছা খোঁপা করে। উঠোনে নেমে হাঁস-মুরগির খোপ খুলে দিয়ে বস্তা আর ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়ে আসে। পাতা কুড়োতে হবে। সকাল-সকাল না করলে পানিতোলার কাজে যেতে দেরি হয়ে যাবে। শরীর চলতে চায় না। একবস্তা পাতা কুড়িয়ে বসে থাকে—বুকে হাঁফ ধরেছে। বয়স বাড়ছে। ওর কত বয়স হল ও নিজে তো জানেই না, মাও বলতে পারে না। জন্মের কথা জিজ্ঞেস করলে ওর মা একটা প্রবল ঝড়ের কথা বলে। আর কিছু মনে নেই। ঝড়ের দিনে ওর জন্ম। সাফিয়ার হাসি পায়। সেজন্যে বুঝি ঝড় মাথায় করে বেড়ে ওঠা—ঝড় নিয়ে দিন কাটানো। সব ঝড় থামে, ওর জীবনের ঝড় আর থামে না। ভালো লাগে না। টানতে-টানতে এখন ক্লান্তি এসে গেছে। তোরাব আলীর বউ যদি কিছু বেশি ভাত দিত তাহলে আর রাঁধতে হত না, ওর পাতা কুড়োতে হত না। পরক্ষণে নিজেকে গাল দেয়—হারামজাদী, তোর লজ্জা করে না! ও শরীর ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আসলে শুকুর ওকে একদম দমিয়ে দিয়েছে। নইলে তোরাব আলীর উচ্ছিষ্ট খেয়ে দিন চালানোর মতি তো ওর কখনো হয় নি! আজ ওকে এমন দুর্বলতায় পেয়ে বসবে কেন? ভাবলেও নিজের ওপর ঘেন্না হয়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে পাতার বস্তা মাথায় তুলে ঘরে ফেরে সাফিয়া। বারান্দায় বসে শুকুর জিয়োলের ডাল দিয়ে দাঁতন করছে। ওকে দেখে একগাল হাসে।

—এই বেয়ানত পাতা কুড়াইতে গেইলা না? আঁই ভাবিলাম কডে গেলা।

কথায় কথায় জড়তা। খোঁয়ারিতে ভালোই আছে। চোখের দৃষ্টিও স্বচ্ছ নয়। সাফিয়া একপলক দেখে মুখ ফিরিয়ে নেয়। চুলোর পাড়ে পাতাগুলো ঢেলে রাখে। শুকুরের সংগে কথা-বলার ইচ্ছে হয় না। বুঝতে পারে শুকুর ওর দিকে তাকিয়ে আছে। বস্তা ভাঁজ করে ঘরে রেখে এসে গত রাতের বাসি ফ্যানে কুঁড়ো মাখায়। শুকুর কাছে এসে বসে।

—কথা ন কও ক্যা?

—ন চর কামত আছি।

—কাম তো হাতত, মুখর তো কাম নাই। গোস্যা হইয়া না?

সাফিয়া কথা না বলে কুঁড়োমাখানো মালসা নিয়ে উঠোনে নেমে হাঁস-মুরগিকে দেয়। শুকুর সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। সাফিয়ার ব্যবহারে রাগ বাড়ে, খোঁয়ারি কেটে যায়। দাঁতন ছুঁড়ে ফেলে কুয়োতলায় মুখ ধুয়ে লুঙ্গিতে মুছতে-মুছতে ফিরে আসে। সাফিয়াও ততক্ষণে বারান্দায় ফিরেছে। শুকুর ওর বাহু খামচে ধরে।

—ছাড়ি দাও। ও ঝামটা দেয়, কিন্তু ছাড়াতে পারে না।

—অ্যাত অল্পতা ছাড়া পাইবা না। অ্যাত ত্যাজ কিয়র?

শুকুরের চোখে আক্রোশ। মুহূর্তে থমকে যায় সাফিয়া। এই শুকুর একদম অন্যরকম। ওর অচেনা কিন্তু ভয়ংকর। ঠিক ঝড়ের মতো। জন্মের ঝড় ওকে কিছুতেই ছাড়ে না, কেবলই ভেঙেচুরে তচনচ করে।

—আঁই আজুয়াই কাজী আইনাম।

—না! সাফিয়া চিৎকার করে ওঠে।

—না ক্যা?

—আঁই বিয়া ন কইরগাম।

—না করিবা? কইলেই হৈল না? ন করিলে কাডিয়ারে নাফ নদীত ভাসাই দিয়ম।

সাফিয়া স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে। শুকুর ওকে দু হাতে জাপটে ধরে। মুহূর্তের আদরে ভাসিয়ে দেয়।

এত নিবিড় সে সোহাগ যে সেখান থেকে পার পাওয়ার কোনো উপায়ই নেই।

লোকটা নিমেষে অন্যরকম হয়ে যায়।

—কও, গোস্যা আছে না?

সাফিয়া মাথা নাড়ে—নিরুপায় স্পন্দন। বিবমিষা সমস্ত শরীরে।

—তুই তৈয়ার থাইক্যো। আঁই ব্যাক গছোই সন্ধ্যার সময়ত আইসাম। হৃদা আই, মকবুল আর কাজী। তোঁয়ার মা-রে কই রাইখ্যো। হিতাই তো আবার আঁরে দেইত না পারে।

—আজুয়া ন।

—ক্যা ন? বারবার ন কইবা কইলাম। যদি রাজি ন থাক তইলে রক্তারক্তি হই যাইব।

—আঁই কি ন কই না? কইলাম যে আজুয়া ন।

—ন, আজুয়াই হ-ন পড়িব।

কথাটা ঘোষণা করে শুকুর সদম্ভে চলে যায়। নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া সাফিয়ার আর কিছুই করার নেই —শুকুরকে তো ও নিজেই ডেকে এনেছে। এখন এই বিষ গলায় রাখা শিখতে হবে। পরক্ষণে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে পানতা খেতে বসে। ওদের যা জীবন তা এভাবেই চলে। বেশি ভেবে, বেশি গুছিয়ে চলে না। তিন দিনের ভাত যাদের ঘরে থাকে না, তাদের আবার হিসেবনিকেশ কী? এক শুকুর যাবে, অন্য শুকুর আসবে। তালাক দেবে, বিধবা হবে—এটাই তো নিয়ম। তবু তো শুকুরের রাগ আছে, জোর করে। এটুকুই এখন ওর সম্বল। নিজের ওপর প্রসন্ন হবার চেষ্টা করে।

বিকেলে একটা বড়ো মাছ, দুটো মুরগি, চাল-ডাল, মসলাপাতি পাঠিয়ে দেয় শুকুর। মকবুল নিয়ে আসে। জিনিসগুলো দেখে সাফিয়ার বুকের ভেতর কাঁপুনি জাগে। জয়গুন তখনো ফেরে নি। ফিরতে-ফিরতে বেলা গড়িয়ে যাবে। মকবুল একগাল হাসে। অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে কথা বলে :

—শুকুর ভাই এক্কানা আগে পাডাই দিয়ে। পাকশাক শ্যায় করন। আঁরার সন্ধ্যাত আইর। মুরগি দুঅয় জবাই করি আন্যি।

সাফিয়া কথা বলে না দেখে মকবুল বিব্রত বোধ করে :

—কথা ন কন ক্যা ভাবিসাব?

—আপনে অন যাতক।

—যাইতে কন ক্যা? আপনে তো আঁরার ভাবি।

—কইলাম তো অন যাতক।

—আইচ্ছা।

মকবুল কথা না বাড়িয়ে চলে যায়। ঝোলা থেকে সওদা নামায় সাফিয়া। অনেক কিছু পাঠিয়েছে শুকুর। কত দিন পোলাও খায় নি ও। ভালো খাবারের জন্যে জিভে পানি এসে যায়। অকস্মাৎ বড়ো কাছের মনে হয় শুকুরকে। বড়ো আপনজন, খিদে মিটিয়ে দিতে পারে। পুরুষমানুষ কখনো-কখনো অন্যরকম হয়, সেটা নিয়ে কি রাগ করতে আছে? সাফিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দেয়। কাল রাত থেকে যে কষ্টে আছে সেটাকে তাড়িয়ে দেয়। শুকুরই ভালো, শুকুরই প্রিয়। ও নিজের বিশ্বাসের বলয়ে ফিরে আসে। খুশি মনে মাছ কাটে, মুরগি বানায়। পোলাওর চাল ধুয়ে আনে। আজ আর শুকনো পাতায় রান্না করা যাবে না—কাঠ চাই। বর্ষার মৌসুমের জন্যে কিছু কাঠ চৌকির নীচে রাখা আছে, সেগুলো বের করে আনে।

তখুনি জয়গুন ফেরে।

—কই ব্যাপারডা কী? জয়গুনের কণ্ঠ অসহিষ্ণু।

সাফিয়া একমুহূর্ত থমকে যায়।

—কথা ন কছ ক্যা?

—আজুয়া আঁর বিয়া।

—বিয়া?

—সন্ধ্যাত কাজী লই আইব। সওদা পাডাইয়ে। রাইনতে কইয়ে।

—অ।

জয়গুন থপ করে বসে পড়ে। কাপড়ে-বাঁধা ভাতের থালা কোলের ওপর। সাফিয়া পাশে এসে দাঁড়ায়।

—মা, তুই খুশি ন হও?

জয়গুন হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

—তুই ন রান্ধিলে আঁর মুখত ন রুচে। কত দিন পোলাও ন খাই, মাগো। মা, তুই আজুয়া রান্ধো। সাফিয়া খুশি-গলায় বলে। ওর আনন্দ জয়গুনকে স্পর্শ করে না। শূন্যদৃষ্টিতে চুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—তোঁয়ার ভাতউন থক। আঁরা বেয়ানে পানিভাত খাইয়াম। অন উডো।

সাফিয়া জয়গুনের হাত ধরে টেনে তোলে। ও

সাফিয়ার হাত ছাড়িয়ে কুয়োপাড়ে আসে। বুক ফেটে কান্না আসে জয়গুনের। মেয়েটা একটা অন্ধকার জলা-ভূমিতে পা দিতে যাচ্ছে। ওখান থেকে ও কোনোদিনও উঠতে পারবে না। জয়গুনের চোখে জল, বারবার পানির ঝাপটায় ধুয়ে ফেলতে চায়।

সন্ধ্যার পর-পরই বিয়ে হয়ে যায়। এখন আর সাফিয়ার মনে কোনো দ্বিধা নেই। বরং নিজের কৃত-কর্মের ওপর আস্থাশীল। শুকুর ওকে সুন্দর শাড়ি দিয়েছে। আলতা, কাজল, কাচের চুড়ি দিয়েছে। সুগন্ধি তেলও এনেছে। এত-কিছু একসঙ্গে ও কখনো দেখে নি। ভালোই লাগছে। প্রথম বিয়ের সময় ওরা কিছু দেয় নি, সে স্মৃতি এখন ও মনে আনতে চায় না। জয়গুন সবাইকে খাইয়েছে। পেট ভরে খেয়ে সবাই খুশি। সুন্দরভাবে বিয়ের পর্ব শেষ. সাফিয়ার একটুও অতৃপ্তি নেই। কাজী আর মকবুল চলে গেলে শুকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে। জয়গুন হাঁড়িকুড়ি গোছাতে ব্যস্ত। আজ কাঠ দিয়ে রান্না হয়েছে বলে চুলোর আগুন নেভে নি। জয়গুন হাঁটুতে থুতনি রেখে বসে থাকে। কাঠের আগুন এখনো গনগনে, একটু-একটু করে নিভছে। নিভুক, জয়গুন বসেই থাকবে।

[ক্রমশ

আগামী সংখ্যা থেকে
সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের
ধারাবাহিক উপন্যাস
অলীক মানুষ

এক মুসলিমপাঁর পরিবার আর তার চারপাশের সমাজের বিগত একশ বছর ধরে উত্থান-পতন, জিন-পরী-হুরী, রাজনীতি আর পাপ-পুণ্য, পরদানশিন রমণী, টালমাটাল সময়, অপরাধ আর রহস্যময় প্রকৃতি, সাধারণ মানুষ আর তার লোভ-ইচ্ছা নিয়ে এক অতিপ্রাকৃত বিন্যাসে রচিত এই উপন্যাসের যাত্রা এক অজানা দ্বীপ আবিষ্কারের পথে...

পয়লা আষাঢ়ে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পানপাতাটা তোমার, বউ
এই হেতেরটা আমার।
তোমার সবই
আপ্‌গরজে আপনি হয়
আমারগুলোই
পিটিয়ে গড়ে কামার।

এই রঙটা তোমাকে টানে
এই রঙটা আমায়।
একটি তোমায় অবাধে ছোটায়
একটি আমায়
হাত দেখিয়ে থামায়।

গুচ্ছের ফুল দেখো, ও বউ
হাসছে তোমার খোঁপায়।
ফুলের মালা
কেবল আমার গলা জড়িয়ে
জানি না কেন কিসের জন্যে ফোঁপায়।

জানলা দাও, দরজা খোলো
কড়া নাড়ছে
বাইরে পয়লা আষাঢ়।
শুধু জ্বলুক একটি জোনাক
আমাদের এই
বাবুইপাখির বাসার॥

ডাক কেন হে বৃষ্টি

খালেদা এদিব চৌধুরী

তুমি এত অঘোর বেলায় কেন ডাক দিলে
শ্যামল পাতার আড়ালে চাঁদ খেলা করে
সবুজ মাঠ, রুপালি মাছের পুকুর
শিমুলগাছের মাছরাঙা পাখিটাও জানে
তুমি কেন ডাক শিল্পতরু!

তোমার ভেতরে কি জেগে ওঠে মধ্যরাত!
আমার এ শূন্য সময় তা জানে না
কেউ সাক্ষীও নেই—বকুলফুল ঝরতে-ঝরতে
কেউ ডাকে নি সরল বিশ্বাসে।

আজ তোমার ভেতরে কী জ্যোৎস্নার লুকোচুরি
পৃথিবীর শীতল বাতাস কী খেলা করে সেখানে
অথচ কঠালিচাঁপার ডালে দুটো চড়ুই পাখিও
আমাকে বলে নি এসব,
আসলে সবই ছলছাড়া এবং শূন্য।

এখন কেন ডাক যুইকামিনীর মতো
কেন শাদা পাপড়ি ঝরে পড়ে ধূসর অন্ধকারে
সব কাঁপছে,
এই বায়ু, আকাশ, বকুলগাছের পাতা—
এত বারিপাত এই অবেলায়!

পৃথিবীতে কতদিন শোক বেঁচে থাকে!
সেসব কথা কেউ আমাকে বলে নি—
কেউ বলে নি, প্রিয় নামে থাকে কতটা বিষাদ
আজ ডাক কেন হে বৃষ্টি, কেন হে অন্ধরাত!

আদিবাসী শিল্পকলা

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

সামান্য জলের চাপ, সমস্ত পৃথিবী তাতে গলে ভেসে যায়
দূরে নামে অন্ধকার, আরো দূরে ঘুমঘোর—
ভালোবাসা ম্রিয়মাণ গল্পে মেতে আছে—বালিকার মতো
হঠাৎ জলের চাপে চূর্ণমুখ, হিমহাসি, হেসে ওঠে বিজলীপ্রভায়!

আকাশও আহত আজ। ক্ষতমুখে জমে থাকে ফেনা।
শুধু এই বালিকার অভিমান, ছিঁড়ে-যাওয়া জন্মের ফল
কেন যে প্রবাসপ্রিয় বালকের ক্রমাগত অবাঞ্ছিত তীরে
আলোড়ন তোলে! ঘোড়া থামতে জানে না ;

বলে : এসো, সশব্দ ফোয়ারা, তুমি পুরোনো ছায়ায়
শুয়ে পড়ো, তারপরই ছিঁড়ে যাওয়া প্রকৃত সম্ভব...
তারপরে সারারাত্রি আমারই মতন প্রায় অশ্লীল-শিবির,
অঙ্গ খুলে দেখা যাক কত নদী আছে মোহানায়!

হায়রে জলের গান! কোন্ বাহু সংগমপ্রয়াসী!
এসব আদিম ছবি, এঁকেছিল বহু আদিবাসী।

আবহ

গৌতম দাস

লবণাম্বু হাওয়া এসে দাগায় মন্দির
দিন-দিন
প্রকৃত মানচিত্র ছিঁড়ে সমুদ্র-কৌতুক যতিপর্বপঙ্‌ক্তিহীন
আমার আত্মার দিকে ছুঁড়ে মারে উপদ্রব—
কাঁচের বাসন...

আসন গেড়েছি আমি
জল আর মাটির নুড়োই
তাই
লণ্ডভণ্ড চুলে নুন চোখে নুন উপরন্তু ত্বক
ভেজা শ্রমে

জনক্রমে
আত্মা খেলে, লাস্য করে আর আমি
সমুদ্র-আত্মার ঘাতে ভেঙে-পড়া কাঁচের কুচির মধ্যে
চমকে চমকে উঠি জেগে
ক্রমাগত...

ক্রান্তদর্শী

অন্নদাশঙ্কর রায়

জুলির সরল বেশ, সরল ভূষা, গৃহকর্মনিপুণতা দেখে বাবলী রসিকতা করে, "তুই যে পুরোদস্তুর কস্তুরবা বনে গেলি রে! তোকে দেখে বিশ্বাস হয় না যে তুই জুলি। পতিব্রতা বলে এতখানি পতিব্রতা! তুই যে সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী, শৈব্যা প্রভৃতির একজন হয়ে গেলি রে! চিরন্তনী ভারতনারী। পরে যখন মা হবি তখন উমা হৈমবতী। অবাক করলি, জুলি।"

কলকাতার প্রসঙ্গ ওঠে। বাবলী স্বপনদাদের দুর্ভোগের কাহিনী বিস্তারিতভাবে শোনায়। এল্‌ফের কথাও ভোলে না।

"আমার মা কেমন আছেন? অনেক দিন খবর পাই নি।" জুলি সুধায়।

"দেখা হয় নি। খোঁজও নিতে পারি নি। তবে ও পাড়াটা এখনো পাকিস্তান হয় নি। সবাই নিরাপদ।" বাবলী অভয় দেয়।

এর পরে অনেক দুঃখদুঃখের কথা। জুলিকে মিলি দুচক্ষে দেখতে পারে না। ওর মা-বাবার ভালোবাসার টানে সে ওঁদের ওখানে এতদিন ছিল, এখন ওর নিজের কুটিরে উঠে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। কিন্তু এদিকেও নিন্দুকের চিটকারি শুনতে হচ্ছে। দিশি কুঁড়ে ঘরে বাস করে, বিলিতি টয়লেটে মাঠ করে!

"ওদের চুকলিতে কান দিতে নেই, ভাই। গাঁয়ে-গাঁয়ে বেড়াতে গিয়ে আমারও কি কম অসুবিধে হচ্ছে? তা বলে তো কমোড আশা করতে পারি নে। তুই বোধহয় গ্রাম-অঞ্চলে যাস নি। শহরে বসেই গ্রাম-উন্নয়ন করছিস। আজ হোক, কাল হোক, তোকেও গ্রামে-গ্রামে ঘুরতে হবে। যদি সত্যি কস্তুরবা হয়ে থাকিস। ওইটেই অ্যাসিড টেস্ট।" বাবলী খিলখিল করে হাসে।

"গ্রামে যাই নি তা নয়।" জুলি সংকোচের সঙ্গে বলে। "দিনের বেলা চেপে রেখেছি। রাতের অন্ধকারে মাঠে জঙ্গলে গেছি। এখন বুঝতে পারি কেন এত নারীহরণ হয়। স্বরাজ তো হল। এবার এর একটা স্থায়ী প্রতিকার চাই।"

"স্বরাজ তো হল!" ব্যঙ্গ করে বাবলী। "রক্তবর্ণ শৃগাল ওই জবাহরলাল নেহরু। বিপ্লবও করেন নি, জারকেও তাড়ান নি, জারের অনুগ্রহে তাঁর শাসনপরিষদের পারিষদ হয়ে বলছেন ওটাই নাকি প্রোভিজনাল গভরনমেনট! দুদিন বাদে লাথি মেরে বিদায় করে দেবে,

অ-পদস্থ হয়ে জেলে ফিরে যাবেন, মুসলমানরা এমনি আনন্দের সঙ্গে 'মুক্তি দিবস' পালন করবে। আর জিন্না শাসাবেন, কংগ্রেস গদিতে ফিরে এলে আবার তুলকালাম কাণ্ড করব। লেনিনের ভাষায় কথা বললে কী হবে? লেনিন তো নন। গান্ধীও নন। আসলে উনি একজন ফেবিয়ান। লেবার গভরনমেনটের বেশির ভাগ সদস্যই ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য। ও'রাও যে শস্ত হয়ে গদিতে বসতে পারবেন তাও নয়। রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাওয়া এক দিবাস্বপ্ন।"

এমন সময় সৌম্যর প্রবেশ। হাতে সাজিভরা লাল-পদ্ম। বাবলী উঠে দাঁড়ায়। কী মনে করে অভুমি প্রণত হয়।

সৌম্য চমকে ওঠে। "ও কী! কমিউনিসটরাও প্রণাম করে নাকি!"

"তোমার কাছে আমি কমিউনিসট নই, আমি ছোটো বোন। তা ছাড়া তুমি একজন সাধু সন্ত। মাথা আপনি নত হয়ে আসে।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মতো ওর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয় সৌম্য। বলে, "এই যে কুটিরটা দেখছ, এটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদ্যাইঘাটের কুটিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছে। সাজনো হয়েছে। সিলিং থেকে শিকেয় করে ঝুলছে হাঁড়ি পাতিল। তাতে চিঁড়ে, মুড়ি, খই, পাটালি, বাতাসা, দুধ, দই, ছানা, চা, চিনি। দড়ি ধরে টান দিলে সুড়সুড় করে নেমে আসে। কোন্‌টা খাবে, বলো।

বাবলী ইতস্তত করে। সৌম্য তখন ওর সঙ্গিনীর দিকে তাকায়। সেও প্রণাম করেছিল। "তোমার পরিচয় তো দিলে না।"

"মুরলারানী সরখেল। আমি এইখানকারই মেয়ে। বেহুলাদির গাইড হয়ে এসেছি। কিন্তু কমিউনিসট নই।" মেয়েটি বলে।

"বেহুলাদি! বেহুলাদিটি কে?" সৌম্য বাবলীর দিকে তাকায়।

"ওঃ! তোমরা জান না যে আমাদের একটা ছদ্মনামও থাকে। পুলিশের চোখে ধুলো দিতে হলে ও ছাড়া আর উপায় কী! লেনিন, স্টালিন, ষ্টেটস্কি, গরকি—এসব ছদ্মনাম ছাড়া কিছু নয়। আমারও তেমনি ছদ্মনাম বেহুলা। হিন্দুদের কাছে বেহুলা দেবী। মুসলমানদের কাছে বেহুলাবিবি। কিন্তু যতই যাই করি না কেন, পুলিশ সব খবর রাখে।" বাবলী হাসে।

সৌম্য শিউরে ওঠে। "তুমি কি বোঝাতে চাও আমাদের আশ্রমেও?"

"হ্যাঁ, তোমাদের আশ্রমেও। তেমনি, পুলিশেও আমাদের লোক আছে। কোথায় নেই? প্রত্যেকটি অফিসেই। প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজেই। এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে আমরা সর্বত্র ঢুকেছি।" বাবলী হাসি-মুখে বলে।

জুলি কৌতূহলী হয়ে সুধায় লিখন্দর বলে কেউ আছে কি না। বাবলী হেসে উড়িয়ে দেয়। "কোন্ সাহসে লিখন্দর হবে? সাপের কামড়ে মরবে না? তখন ওকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে ভেলায় করে ভাসতে হবে নাকি?"

দড়ি টেনে একে-একে নামানো হয় হাঁড়ি পাতিল। যে যার পছন্দমতো খায় যেটা খুশি।

"তোরা আজ এইখানেই ভাত খেয়ে যাবি। সবাই মিলে একটু গল্পগুজব করা যাবে। রাজনীতি নয়।" জুলি নিমন্ত্রণ জানায়।

বাবলীরা রাজি হয়। তখন জুলি রান্নাঘরে গিয়ে রান্নার উদ্যোগ করে। মুরলা তার সাথী হয়। কুটিরে আর একটি মেয়েও ছিল। আশ্রমিকা। কালী।

বাবলী সৌম্যকে স্বপনদার কাহিনী শোনায়। সেটা শোনানোর জন্যেই এখানে আসা। মানসের অনুরোধে। স্বপনদা নিজে তো লিখবেন না, হাত কাঁপে।

"স্বপনদা তো বউদির মতে প্রচ্ছন্ন মুসলমান। ও'র মাতুলবংশ মোগল আমলের রইস। তাঁদের লাইব্রেরিতে এনতার ফারসি কেতাব। আদবকায়দাও অনেকটা অভিজাত মুসলমানদের মতো। তাঁদের মতো সেই দোষ দুটোও ছিল। সুরা আর সাকী। ও'রা লখনউ থেকে, বেনারস থেকে বাঈজীদের আনিয়ে গান শুনতেন, নাচ দেখতেন। স্বপনদার শৈশবটা তো মুরশিদাবাদের নবাবি আবহাওয়াতেই কেটেছে। সেই মানুষকে যে মুসলমানরাই ঘরছাড়া করবে এটা কি কখনো ভাবা যায়? এর অভাবনীয়তাই তাঁকে বিহ্বল করেছে। বউদিকে নয়।" বাবলী বিবরণ দিয়ে বলেন।

সৌম্য দুঃখ প্রকাশ করে। "শুধু প্রচ্ছন্ন মুসলমানরা কেন, প্রকাশ্য মুসলমানরাও আজ দারুণ এক বিভীষিকার রাজত্বে বাস করছেন। ইংরেজ থাকতেই এই! ইংরেজ চলে গেলে মুসলিম লীগ যে কী না করবে তাই ভেবে প্রকাশ্য মুসলমানরাও আতঙ্কিত। মওলানা ইসমাইল হোসেন জালালাবাদীর নাম শুনেছ? খেলাফত আন্দোলনে তিনি আর আমি জেলবন্দী ছিলুম। সেদিনকার অনেকে মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে ঘোরতর কমিউনাল হয়েছেন। কিন্তু মওলানা সাহেব এখনো খাদি পরেন, চরকা কাটেন, গঠনের কাজে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছেন। এমন মানুষের উপরেও লীগপন্থীদের রোষ। কেন তিনি পাকিস্তান সমর্থন করেন না? কেন তিনি ডাইরেকট অ্যাকশন দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেন নি? তাঁর নাম এখন হয়েছে কালো ভেড়া। মুসলমানরা আর সবাই শাদা ভেড়া। ওরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে নামকা ওয়াস্তে একটা প্রস্তাব পাশ করেছে বলে ওরা নাকি লয়ালিসট নয়। ওরাই খাঁটি ন্যাশনালিসট। মুসলিম ন্যাশনালিসট। আর মওলানা সাহেব নাকি লয়ালিসট। তাঁকে ওরা একঘরে করেছে। পারলে ঘরছাড়া করবে। দিল্লীতে আজ যে রক্তবন্যা হচ্ছে তাতে থাকছেন আজাদের বদলে আসফ আলী। তিনি কি মুসলমান নন? আর থাকছেন আলী জহীর আর শাফাত আহমদ। এ'রাও কি মুসলমান নন? শাফাত আহমদকে বার বার ছোরা মেরেছে এক লীগপন্থী মুসলমান যুবক। ভদ্রলোকের প্রাণ নিয়ে টানাটানি। স্বপনদার তো প্রাণ নিয়ে টানাটানি নয়। প্রকাশ্য মুসলমান হলে সেই আশঙ্কা ছিল।"

বাবলী স্বীকার করে যে লীগপন্থীদের পয়লা নম্বরই শত্রু এখন পাকিস্তানবিমুখ অন্য দলের মুসলমানরাই। তবে কমিউনিসট মুসলমানদের কথা আলাদা। তাঁরা পাকিস্তানের জন্যে মন খোলা রেখেছেন। হয় ভালো, না হয় ভালো। হলে তাঁরা পাকিস্তানেও থাকবেন, হিন্দুস্থানেও থাকবেন। কংগ্রেসিদের মতো পাকিস্তান ছাড়বেন না। এটা সুবিধাবাদ নয়, এটাই বাস্তববাদ।

জুলি আঁতকে ওঠে। "তুই বলতে চাস পাকিস্তান হলে আমাকেও এই আশ্রম, এই কুটির ছাড়তে হবে?"

"যদি কংগ্রেসে থাকিস তা হলে ছাড়তে হবে। নিছক গঠনের কাজ নিয়ে থাকলে কেউ তোকে আশ্রম ছাড়তে, কুটির ছাড়তে বলবে না। কিন্তু তুই কি রাজনীতি ভুলতে পারবি?" বাবলী সন্দেহ করে।

সৌম্য নীরব থেকে কী যেন চিন্তা করে। তারপরে বলে, "না, বাবলী, আমি ভুলতে পারব না যে আমি একজন সত্যাগ্রহী। পাকিস্তান যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে যুদ্ধের নৈতিক বিরুদ্ধ হচ্ছে সত্যাগ্রহ। সঙ্গে আর কেউ না থাকলেও আমি সত্যাগ্রহ করব। সত্যাগ্রহী যে হবে তাকে শহীদ হবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। জুলি একথা জানে, বিয়ের আগেই ওকে জানিয়েছি। তবে এইটুকু আমি বলতে পারি যে প্রাণটা আমি সস্তায় বিকিয়ে দেব না। এর জন্যে প্রভূত মূল্য নেব। দেশের স্বাধীনতা বা বিশ্বের শান্তি বা হিন্দুমুসলমানের নিঃশর্ত মৈত্রী বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে নির্বৈর।"

জুলি এতক্ষণ মানসের চিঠিখানা দেয় নি। মনে পড়তেই জিব কেটে বলে, "ভুলে গেছলুম।"

সৌম্য মন দিয়ে পড়ে। তার পর ভাঁজ করে রেখে দেয়। বলে, "হুঁ! এখানেও কলকাতার পুনরাবৃত্তি হতে পারে। সতর্ক থাকতে বলেছে। হিন্দুরা সকলেই সতর্ক রয়েছেন। সেইজন্যে আজ তাঁদের একজনও আনন্দ প্রকাশ করছেন না। মুসলমানদের মতো তাঁরাও শোক-দিবস পালন করছেন। আমাদের এই ঘরোয়া আয়োজনেও আমরা আশ্রমের লোককে ডাকি নি। নিজেরাই যৎসামান্য আনন্দ করছি। জানি এটা পূর্ণ স্বাধীনতা নয়। এমন কী, আধখানা স্বাধীনতাও নয়। এর মহত্ত্ব এইখানে যে ইংরেজে কংগ্রেসে বৈরভাব দূর হয়েছে। ওদের করমর্দন আন্তরিক। আমাদের করমর্দনও আন্তরিক।"

"কিন্তু ইংরেজে কংগ্রেসে বৈরভাব দূর হলেই কি ইংরেজে মুসলিম লীগে মিত্রভাব দূর হবে? ওরা দুপক্ষের মিত্র হয়ে দুই বেড়ালের মধ্যে পিঠে ভাগ করে দেবে। নিজেদের জন্যেও কিছু রাখবে। এ ছাড়া আর কী হতে পারে, সৌম্যদা? তুমি নৈতিক বিকল্পের কথা না ভেবে রাজনৈতিক সমাধানের কথা চিন্তা করো। কলকাতার গণহত্যার পর অনেকেই বলাবলি করছেন যে এর চেয়ে দেশভাগ ভালো, সেইসঙ্গে প্রদেশভাগ। সেটা ইংরেজরাই করে দিয়ে যাক। ওরা ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। কংগ্রেসেরও সাধ্য নয়, লীগেরও অসাধ্য। জানি নে এ ছাড়া আর কোনো রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব কি না। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মুসলিম লীগ খারিজ করেছে। কংগ্রেসও যে সেটা মন খুলে গ্রহণ করেছে তা নয়। দেশের অবস্থা দিন দিন অগ্নিগর্ভ

হচ্ছে। যে কোনো প্রদেশে, যে কোনো অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে।" বাবলী হুঁশিয়ারি দেয়।

"তা বলে আমি বেঠিককে সমর্থন করব না। দেশ-ভাগ বেঠিক। তার উত্তরে প্রদেশভাগও তেমনি বেঠিক। দুটো বেঠিক মিলে একটা ঠিক হয় না। ইংরেজদের কী? ওরা দুই বেড়ালের মধ্যে পিঠে ভাগ করে দিয়ে যাবে, দুটোকেই সোভরেন আর স্বাধীন বলে স্বীকৃতি দেবে, দুই রাষ্ট্রেই বাণিজ্যিক সুবিধা পাবে। কতক লোকের লাভ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু জনগণের দুঃখের বোঝা বাড়বে। তখন আমি স্বাধীনভাবে সত্যাগ্রহও করতে পারব না, হিন্দুস্থানের নাগরিক হয়ে পাকিস্তানে বা পাকিস্তানের নাগরিক হয়ে হিন্দুস্থানে সত্যাগ্রহ করা চলবে না।"

বাবলী আবেগের সঙ্গে বলে, "এই যে কতক লোকের মনে আনন্দ, আর কতক লোকের মনে নিরানন্দ আজ আমরা দেখছি, এর শেষ কোথায়? তুমি কি বুঝতে পারছ না, সৌমাদা, যে যখন তখন যত্রতত্র দাঙ্গা বাধবে আর তা বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ হিমশিম খাবে? পুলিশ একদিন হাল ছেড়ে দিয়ে বলবে, আমাদের দ্বারা হবে না, আরমিকে ডাকুন। আরমিও কি দাঙ্গা বন্ধ করতে পারবে? কটা জায়গায় পারবে? আরমিও হাল ছেড়ে দিয়ে বলবে, আমাদের দ্বারা হবে না, সত্যাগ্রহীদের ডাকুন। তখন পারবে তোমরা দলে-দলে শহীদ হয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করতে? তোমার যদি বাস্তববোধ থাকে তুমি সময় থাকতে মানবে যে দেশের অবস্থা সত্যাগ্রহীরাও শান্ত করতে পারবেন না। তার জন্যে চাই রাজনৈতিক সমাধান। সে সমাধান মুসলিম লীগের সঙ্গে ক্ষমতা-ভাগাভাগি। সেটা কার্যকর না হলে দেশ-ভাগাভাগি। প্রদেশ-ভাগাভাগি। ঠিক নয়, বেঠিক। তবু শান্তির জন্যে একান্ত আবশ্যক।"

সৌম্য তর্ক করে না। স্বচক্ষেই তো দেখতে পাচ্ছে ঘরে-ঘরে নিরানন্দ। যেন স্বদেশী শাসন নয়, নতুন এক বিদেশী শাসন। জুলিকে বলে, "সন্ধ্যায় আজ দীপাবলী হবে না। শুধু প্রার্থনাসভা হবে।"

যাবার সময় বাবলী সৌম্যকে চুপিচুপি বলে যায়, "লক্ষণ যা দেখছি জুলি বোধহয় মা হবার পথে। শহীদ হতে গিয়ে ওকে তুমি পথে বসিয়ো না। তোমার ভাবী সন্তানের খাতিরেও তোমাকে বাঁচতে হবে। শহীদ যদি কেউ হয় তো সে আমার মতো ভাগ্যবিড়ম্বিতা। সেটা কিন্তু বিপ্লবের দিন, বিপ্লবের প্রয়োজনে। সেদিন দেখবে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে গেছে। কেউ কারো গলা কাটছে না। বরং গলায় মালা দিচ্ছে। হাসছ যে? আসিবে, সেদিন আসিবে। তোমরাও সেদিন দেখবে সকলের মনে আনন্দ, নিরানন্দ কারো মনে নয়। যাদের মনে নিরানন্দ তারা পা দিয়ে ভোট দেবে।"

পঁচিশ

সুকুমার লন্ডনে এই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল। বি. বি. সি-তে জবাহরলালের অভিষেকের বার্তা শুনে লাফ দিয়ে ওঠে। মিলিকে বলে, "একটা দিনও দেরি করা উচিত নয়। আমি কালকেই প্লেন ধরে রওনা হচ্ছি। তোমরা জাহাজে করে ধীরেসুস্থে এসো। এখন চলি মেননের সঙ্গে দেখা করতে। নেহরু তাঁর সুপারিশ উপেক্ষা করতে পারবেন না।"

জবাহরলাল ইতিমধ্যেই কর্মপ্রার্থীদের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সুপারিশ যাঁরা করেছিলেন তাঁরাও এক-একজন দিকপাল বা দিকপালিকা। তিনি নিজেও জানেন না তাঁর স্থায়িত্ব কতদিন। কংগ্রেস হাই কমানডের মতিগতি তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়েও জানেন না। আর গান্ধীজীর মতিগতি বল্লভভাই, রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর আবুল কালাম আজাদ হাই কমানডের ট্র্যাইআমভ্যার হয়েও কতটুকু জানেন! পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিতে ওই বৃদ্ধটি সিদ্ধহস্ত।

নেহরু কাউকেই কথা দেন না, সবাইকেই সবুর করতে বলেন। যাঁরা গোড়া থেকেই এদেশে রয়েছেন তাঁদের দাবিই অগ্রগণ্য। যাঁরা বিদেশে থেকে মদত দিয়েছেন তাঁদের দাবি তারপরে। তবে সুকুমার নাছোড়বান্দা। সে দিল্লীতেই ধরনা দিয়ে পড়ে থাকে। গান্ধীজীর প্রার্থনাসভাতেও নিয়মিত যায়। একবার যদি গান্ধীজীর দৃত হয়ে একখানা চিঠি নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে তবে কাগজে নাম উঠবে। সঙ্গে-সঙ্গে সেও একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হবে।

ওদিকে মিলিও অস্থির বোধ করছিল। বিলেত তার আর একটুও ভালো লাগছে না। যুদ্ধকালীন সে প্রেরণা আর নেই। যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে যে একতা দেখে সে মুগ্ধ

হয়েছিল সে একতাও আর নেই। রণের শিক্ষাসমস্যা মেটে নি। তাই সেও আর অপেক্ষা করতে পারে না। আবার আকাশপথেই ফেরে। সংগে রণ। কিন্তু বিলেতের ঘরকন্না গুটিয়ে নেয় না। দেশে কাজকর্ম না জুটলে ফিরতে হতে পারে। সুকুমারও চাকরি ছাড়ে নি। ছুটি নিয়েছে।

মুস্তাফীরা একদিন সৌম্য আর জুলিকে নিমন্ত্রণ করে এই সুসমাচার শুনিয়ে দেন। তাঁদের মুখে আহ্লাদ ধরে না। জুলি কিন্তু পুলকিত হয় না। কাষ্ঠহাসি হাসে। সৌম্য কূটনীতিবিদের মতো দুটি একটি কথা বলে। "তা আপনাদেরও তো সঙ্গ দরকার। নাতিকে নিয়ে খেলা করবার বয়স তো হল। মিলিকে নিয়েই ভাবনা। সে বোধহয় দিল্লী চলে যাবে।"

"সুকুমার যদি কাজ পায়।" মুস্তাফী বলেন, "নেহরু কি আর সেই নেহরু? বৃন্দাবনের কৃষ্ণ এখন মথুরার কৃষ্ণ। রাখাল-বন্ধুদের যিনি চিনতে পারেন না।"

মিলির মা বলেন, "বেশ তো! মিলি এই সেবা-প্রতিষ্ঠানেরই ভার নেবে। তোমারও উচিত জামাইকে বসিয়ে দিয়ে অবসর নেওয়া। কেন ওরা হিল্লী-দিল্লী করবে? লনডনে থাকারও কোনো মানে হয় না।"

জুলি প্রমাদ গণে। মিলি আর সুকুমার যদি এখানেই গুছিয়ে বসে তা হলে আবার না ত্রিকোণ-সম্পর্কের সূত্র-পাত হয়। সে মুখ ফুটে কিছু বলে না। সৌম্যর মুখের দিকে তাকায়।

"ওরা কি পাকিস্তানে থাকতে রাজি হবে, যদি পাকিস্তান হয়?" সৌম্য সুধায়।

বোমা পড়ার আওয়াজ হয়। মুস্তাফী বলেন, "তুমি তো গান্ধীজীর কাছের লোক বলেই শুনি। তোমার কি মনে হয় তিনি কংগ্রেসকে পার্টিশন মেনে নিতে দেবেন? পার্টিশন কি ডিভিসেকশন নয়?"

"যা বলেছেন, মেসোমশায়। তিনি বেঁচে থাকতে মেনে নিতে দেবেন না। কিন্তু যেমন দেখছি, মুসলিম লীগ কিছুতেই কংগ্রেসকে একমাত্র উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করবে না। এমন অনর্থ বাধাবে যে ইংরেজকেই অনন্তকাল থেকে যেতে হবে। এত বড়ো একটা মহা-দেশের মতো দেশকে তো অরাজকতার কবলে ফেলে রেখে যাওয়া চলে না। তাদেরও তো বাণিজ্যিক স্বার্থ বাহত হবে। যে কারণে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে-ছিল সেই কারণেই হাতে রাখতে চাইবে। কংগ্রেস জেলে ফিরে গিয়ে ক বছর অপেক্ষা করবে? আরো ছ বছর? জেল থেকে বেরিয়ে কি দেখবে মুসলিম লীগের চিতাবাঘ তার দাগ মুছে ফেলেছে? পলিসি বদলেছে? নির্বাচনের সময় পাকিস্তানের জিগির তুলে কংগ্রেসি মুসলিমদের ভোটে হারাচ্ছে না? তাদের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে নিছক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর জোরে মুসলিম ভোট পাচ্ছে? অত দূর যেতে হবে কেন, সামনেই তো নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে কনসটিটুয়েন্ট অ্যাসেমবলির অধিবেশন। ওরা যদি যোগ না দেয় অন্যের তৈরি শাসনতন্ত্র কি ওরা গ্রহণ করবে? ওরা চায় আলাদা একটা কনসটিটুয়েন্ট অ্যাসেমবলি। আলাদা এক শাসনতন্ত্র। তার তাৎপর্য আলাদা এক রাষ্ট্র। অধিকাংশ মুসলমানেরও যদি সেই দাবি হয় তবে তো ভিভিসেকশন অনিবার্য। কে ওদের উপর জোর খাটাবে? গান্ধীবাদীরা তো গায়ের জোরে বিশ্বাসই করবে না। জাতীয়তাবাদীরা করেন, কিন্তু কোথায় তাঁদের গায়ের জোর? কামান বন্দুক তো উভয় পক্ষেরই আছে। সৈনিকও আছে উভয় পক্ষের। আসুক মিলি। দেখুক এসে সিপাহি বিদ্রোহের মর্ম কী। সিপাহির বিরুদ্ধে সিপাহির বিদ্রোহও কি সম্ভবপর নয়?" সৌম্য উচ্চস্বরে চিন্তা করে।

"বুঝেছি তুমি কী বলতে চাও, সৌম্য। নেহরু সরকারের সৈনাদের মধ্যেই অন্তর্বিদ্রোহ।" মুস্তাফী বোঝেন।

"জিন্না সাহেবকে সরকার গঠনের ভার দিলেও একই কথা। জিন্না সরকারের সৈনাদের মধ্যেও অন্তর্বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। নেহরুর বেলা হিন্দু-শিখের বিরুদ্ধে মুসলিম। জিন্নার বেলা মুসলিমের বিরুদ্ধে হিন্দু-শিখ। এক্ষেত্রে কোয়ালিশন গভরনমেনটই ডিভিসেকশন এড়াবার একমাত্র উপায়। বড়লাট সেই চেষ্টাই এতদিন করেছেন, কিন্তু জিন্নার নাছোড়বান্দা মনোভাবের জন্যে সফল হন নি। উলটে কংগ্রেসকেই দোষ দিচ্ছেন জিন্না। কংগ্রেস কেন গ্রুপিং সম্বন্ধে ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ সর্বাংশতঃকরণে গ্রহণ করছে না? কেন তার ব্যাখ্যার জন্যে ফেডারল কোর্টে আবেদন করছে? পলিটিকাল ব্যালানসের কি কোর্টে মীমাংসা হতে পারে? তাঁর মতে আসামকে নিষ্ক্রিয় পাল্লায় না চাপালে ব্যালানস সমান হবে না। সত্যের খাতিরে আমাকেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে

মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট চাই তো এক পক্ষের পাল্লা ভারি হলে মিটমাট হবে না। উভয় পক্ষের পাল্লাই সমান ভারি হওয়া দরকার। এটা জরুরিও বটে। আসামের মায়া না কাটালে পার্টিশন অবশ্যম্ভাবী। তা নয় তো সিভিল ওয়ার। সিভিল ডিসওবিডিয়েনসে কাজ হবে না। শহীদ হয়ে আমি কীই বা করতে পারব? বাপুই বা কী করতে পারবেন?"

"শহীদ হবে কে? তুমি? পাগল! তোমার এই সেদিন বিয়ে হয়েছে। সন্তানের সূচনাও লক্ষ করছি।" মুস্তাফী কানে তুলতে চান না। তাঁর স্ত্রীও না।

এতক্ষণে জুলির মুখ ফোটে। "এই, বাবলীকে তুমি সেদিন যা বলেছিলে তার সঙ্গে তোমার আজকের বক্তব্যের মিল কোথায়?"

সৌম্য একটু ভেবে নিয়ে বলে, "আমি চোখ কান খোলা রেখেছি। নানা জনের সঙ্গে মিশছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার কারবার। তাই আমি আগে যা ভেবেছিলুম তার সঙ্গে এখন যা ভাবছি তার মিল থাকছে না। ক্রমে-ক্রমে উপলব্ধি করছি যে দেশের স্বাধীনতা একপক্ষের ইচ্ছাতেই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রের একত্ব অপরপক্ষের ইচ্ছাসাপেক্ষ। আমাদের পক্ষে যেসব মুসলমান ছিলেন তাঁরাও কলকাতার দাঙ্গার পর আমাদের ছেড়ে গেছেন বা যাচ্ছেন। অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতরাষ্ট্রের অখণ্ডতা কিসের জোরে টিকবে? ইংরেজদের বেয়োনেটের জোরে? হিন্দু শিখ তলোয়ারের জোরে? তা হলে অহিংসার মর্যাদা রইল কোথায়? অহিংসার ভবিষ্যৎ কী? বাপু বলবেন, মুসলিম লীগকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তোমরা রামচন্দ্রের মতো বনবাসে যাও। বনবাসে যেতে আমরা রাজি আছি, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের জায়গায় সাম্প্রদায়িকতাবাদকে বসিয়ে দিলে জাতীয়তাবাদের মর্যাদা থাকে না। অহিংসাবাদ হয়তো রক্ষা পেল, কিন্তু জাতীয়তাবাদ হেরে গেল। যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে হার মানে নি তারা মুসলিম লীগপন্থীদের সঙ্গে লড়াই না করেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসরণ করবে? ওরা ভাববে আমরা দুর্বল, আমরা ভীরু, তাই রণছোড়? বলবে, দেখলে তো, ডাইরেক্ট অ্যাকশনের হাতে হাতে ফল! মুসলিম লীগ সিংহাসন জুড়ে বসে দেশের সর্বসাধারণের স্বার্থে শাসন পরিচালনা করবে না, করবে নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থে। তার মিত্র হবে রক্ষণশীল ইংরেজ আর প্রগতিবিমুখ আরব, ইরান, আফগানিস্তান প্রভৃতি রাজ্য। গণতন্ত্র মেনে চললে অধিকাংশ প্রজার ভোটে আইন পাশ করতে হবে, ট্যাকস ধার্য করতে হবে। সেসব কি সে করবে? আইনসভা ডাকবেই না, কনসটিটিউশন তৈরি করবেই না। গণতন্ত্রের মর্যাদা রাখবে না। ভারতের ঐক্য নিশ্চয়ই মহামূল্য, কিন্তু জাতীয়তাবাদেরও তো মূল্য আছে, গণতন্ত্রেরও তো মূল্য কম নয়। অহিংস নীতি নিশ্চয়ই মহামূল্য, কিন্তু স্বাধীনতার এই পরিণাম দেখে কজন অহিংসবাদী অহিংসার ভবিষ্যতে বিশ্বাস রাখবে? আর আমি কি শুধু অহিংসাবাদী? সেইসঙ্গে জাতীয়তাবাদী নই? গণতন্ত্রে আস্থাবান নই? দেশ খণ্ড-খণ্ড হবে, সেই আশঙ্কায় কি আমি নিজের অন্তরাত্মাকে খণ্ড-খণ্ড হতে দেব? বহু ত্যাগস্বীকারের ফলে আমরা দিল্লীতে প্রোভিজনাল গভরনমেনট লাভ করেছি, বড়লাটের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা চালাবার এমন সুযোগ এর আগে পাই নি, কথাবার্তা নিষ্ফল না হলে আমরা ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিনটি পর্যন্ত থাকব। তার পরের দিন থেকে উত্তরাধিকারী হব। নিষ্ফল হলে অবশ্য গদি ছেড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধেই লড়ব। মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নয়। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগকেও ক্ষমতার ভাগ দিতে হবে। তাতে ওদের মন না ভরলে রাজ্যের ভাগ দিতে হবে। হয়তো প্রদেশেরও ভাগ। যেসব অঞ্চলে মুসলিম মেজরিটি সেসব অঞ্চলের মায়া কাটাতে হবে। নিরুপায়।"

"সে কী?" জুলি আঁতকে ওঠে। "সীমান্ত গান্ধীকে নেকড়ের মুখে ঠেলে দেবে? মহাত্মা গান্ধী রাজি হবেন?"

"আটকাচ্ছে তো সেইখানেই। পানজাবকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিলে সে যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও সঙ্গে-সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নেহরু আর প্যাটেল এতে রাজি হলে বাপুও নিজের মত চাপিয়ে দেন না। সাধারণ অবস্থায় তিনি শুধু পরামর্শদাতা। অসাধারণ অবস্থায় সেনাপতি।" সৌম্য যত্ন করে বোঝায়।

মুস্তাফী মন্তব্য করেন, "কংগ্রেস তো আর মুসলিম লীগ নয় যার এক হাতে পুলিশের ব্যাটন, আরেক হাতে গুন্ডার ছোরা। কে কাকে ঠেকাবে? আমাদের কপালে কী আছে ভেবে ভয়ে-ভয়ে রয়েছি। কংগ্রেস দিল্লীর মসনদে বসেছে বলেই এখনো এখানে বাস করছি, কংগ্রেস যদি মসনদ ছাড়ে আমরাও পূর্ববঙ্গ ছাড়ব। আশা করি কলকাতা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। সেখানে আমাদের একটা আস্তানা আছে, জান। কলকাতা যদি গুন্ডাদের রাজধানী হয় তবে আমরা লনডনে গিয়ে সুকুমারের আস্তানায় মাথা গুঁজব।"

দিন কয়েক পরে সুকুমার এসে সশরীরে উপস্থিত। সঙ্গে মিলি আর রণ। ওদের কলকাতায় রিসিভ করেছে সুকুমার।

ওরা একদিন কুটির দেখতে আসে। মিলি জুলিকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে চুমুর পর চুমু খায়। "ওই চমৎকার ইভেনটটি কবে নাগাদ ঘটবে রে, মেয়ে? আহা, ব্রহ্মচর্যের কী মহিমা! ভারজিন বার্থ নয়তো?"

জুলি ওর দুই গালে দুই চড় কষিয়ে দেয়। "নিজের কথা ভেবে দ্যাখ। কোথায় তোর চিরকুমারীব্রত?"

দুজনেই হাসাহাসি করে লুটোপুটি খায়। তার পর জুলি রণকে আদর করতে বসে। মিলি ঘুরেফিরে দেখে। টয়লেট দেখে বলে, "বিলেতের কটেজেও এমনটি দেখা যায় না।"

ওর বাড়া সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে? জুলি ধন্য হয়ে যায়।

ওদিকে সুকুমার বলছিল সৌম্যকে, "না, ভাই, চাকরি জোটাতে পারি নি। মোগল যুগের দরবার। সব ধরাধরির ব্যাপার। কাকে ধরলে কী মেলে তা জানতে হলে আরো কয়েক মাস দিল্লীতে থাকতে হয়। ততদিন কংগ্রেস-পরিচালিত গভরনমেনটটাই থাকবে কি না সন্দেহ। নেহরু এখন পরম অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন। বড়লাট রোজ মনে করিয়ে দিচ্ছেন মুসলিম লীগকে বখরা না দিলে ওরা জেহাদ ঘোষণা করবে। মুসলিম রেজিমেনটগুলো কনট্রোলের বাইরে চলে যাবে। তা বলে তো খাল কেটে কুমিরকে ডেকে আনা যায় না। জিন্নার দল এসে ভিতর থেকে সাবোটাশ চালাবে। তখন নাস্তানাবুদ হয়ে পদত্যাগ করতে হবে। তার পরের পদক্ষেপটা কী? গান্ধীজী তা খুলে বলতে চান না। শুধু বলবেন কনসটিটুয়েনট অ্যাসেমবলিই হচ্ছে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের পরিবর্ত। তা ছাড়া তাঁকে তো সব দিক বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস সরে গেলে প্রদেশগুলোর থেকেও তো সরে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর আসাম পড়বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীদের কবলে। আর পানজাবেও হয় মুসলিম লীগ মন্ত্রিমণ্ডল, নয় গভরনরের শাসন। তা যদি হয় তবে পাকিস্তানের ষোলো কলাই তো পূর্ণ হল। সমগ্র আসাম, সমগ্র বঙ্গ, সমগ্র পানজাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্থান। তখন ওরা যদি পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে বাধা দিচ্ছে কে? ইংরেজরা নিশ্চয়ই নয়। কংগ্রেসকে অত বড়ো ঝুঁকি যদি নিতে হয় তবে দু বছর বাদে। দিল্লীর ভিতরের খবর মুসলীম লীগ ইনটারিম গভরনমেনটে আসছে। ওরা এলে মুসলমানরাও চাকরির বখরা চাইবে। আমার কতটুকু আশা!"

সৌম্য আশ্বাস দেয়, "চাকরির দরকার কী? তোমার শ্বশুরের প্রতিষ্ঠান তোমরাই চালাবে। তুমি হবে সেক্রেটারি, মিলি হবে ডাইরেকটর, কিংবা মিলি হবে সেক্রেটারি, তুমি হবে ডাইরেকটর। পারিশ্রমিক যা পাবে তাতেই তোমাদের চলে যাবে। একটিই তো সন্তান।"

"হুঁ। প্রস্তাবটা নতুন নয়। কিন্তু এই অধমেরও আত্মমর্যাদা বলে কিছু থাকতে পারে। সে ঘরজামাই হতে যাবে কোন দুঃখে? লনডনে তার নিজস্ব আস্তানা রয়েছে। উপার্জনও আছে। ক্রিপস থেকে আরম্ভ করে অনেকেই তাকে একডাকে চেনেন। ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবের সে মেমবর। ফেবিয়ান সোসাইটিতেও তার যাতায়াত আছে। ইনডিয়া অফিস আর ইনডিয়া হাউস দুই জায়গাতেই তার কনট্যাকট রয়েছে। সে বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়েছে ক্যাবিনেট মিশন স্কীম যদি উভয় পক্ষ মেনে না নেয় তবে মুসলিম লীগকে অফার করা হবে খণ্ডিত পাকিস্তান আর কংগ্রেসকে খণ্ডিত ভারত। সেটাও যদি অগ্রাহ্য হয় তবে প্রত্যেকটি প্রদেশের হাতে হবে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর, তার পরে ওরাই স্থির করবে ওদের মাথার উপর থাকবে একটি ছত্র না দুটি ছত্র। অর্থাৎ একটি সার্বভৌম কেন্দ্র বা দুটি সার্বভৌম কেন্দ্র। আমি অনেকটা নিশ্চিতভাবে জেনে এসেছি যে পূর্ববঙ্গ পড়বে পাকিস্তানেরই ভাগে। তাই এখানকার সম্পত্তির উপরে আমার একরত্তিও লোভ নেই। মিলি যদি রাখতে চায় রাখবে। বেচতে চায় বেচবে। আর মেসোমশায়ের সেবাপ্রতিষ্ঠান তো কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এটা একটা পাবলিক ট্রাসট। ট্রাসটীরা মেসোমশায়ের

অবর্তমানে মিলিকে বা আমাকে সেক্রেটারি বা ডাইরেকটর পদে বহাল রাখবেন কিনা তার নিশ্চয়তা কোথায়? বিশেষ পাকিস্তানি আমলে। আর সব প্রতিষ্ঠানের মতো ওটাকেও ওরা ইসলামাইজ করবে। পাকিস্তান মানেই তো মুসলিমদের জন্যে মুসলিমদের দ্বারা শাসিত মুসলিম রাষ্ট্র। না, তাই, এদেশে বাস করতে আমার একটুও আগ্রহ নেই। রিটেনেই উনিশ বছর কেটে গেল, বাকি জীবনটাও কেটে যাবে। সেখানে আমার অনেক বেশি অধিকার। আমার ভোটে মন্ত্রী-পরিবর্তন হয়। এদেশে কি তার জো আছে? তোমরা যে কোন দুঃখে এখানে কুটির করে বাস করবে তা তোমরাই জান। স্থনীয় হিন্দু প্রধানরা এখন থেকেই কলকাতায় বাসা খুঁজছে। তাঁদের আশঙ্কা এবার ঢাকায় বা চট্টগ্রামে হাঙ্গামা বাধবে।" সুকুমার এক নিঃশ্বাসে বলে যায়।

"যাতে না বাধে তার জন্যেও স্থানীয় অফিসাররা সজাগ রয়েছেন। ডাইরেকট অ্যাকশন ডে এখানে শান্তি-পূর্ণ ছিল। দোসরা সেপটেম্বরের শোকদিবসও শান্তিতে কেটেছে। তাঁরা সবাই চান কংগ্রেসের সঙ্গে আপস। কট্টর লীগপন্থীদের আপসবিরোধী পলিসি তাঁরা সমর্থন করেন না। হিন্দু মুসলমান বরাবর এক-সঙ্গে বাস করেছে, বরাবর একসঙ্গে বাস করবে। এটা যেমন আমাদের কথা তেমনি ওদেরও কথা। কট্টর মুসলিমদের নিয়ে ওদের যেমন মুশকিল কট্টর হিন্দুদের নিয়ে আমাদেরও তেমনি মুশকিল। এক হাতে তালি বাজে না। আরেক পক্ষ পালটা না দিলে দাঙ্গা জমে না। পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা বাধলে হিন্দুর পক্ষে শোচনীয় হবে, তাই হিন্দুকেই হতে হবে যথাসম্ভব অহিংস। রামকে রহিম মারলে রাম রহিমকে আত্মরক্ষার জন্যে যতটুকু দরকার ততটুকু মারতে পারে, কিন্তু প্রতিশোধ নেবার জন্যে করিমকে বা আবদুলকে মারবে না। নির্দোষ মুসলমানকে মারার মধ্যে বিন্দুমাত্র পৌরুষ নেই। তেমনি নির্দোষ হিন্দুকেও।" সৌম্য হিংসার সীমা বেঁধে দেয়।

কৃষ্ণ মেননকে জবাহরলাল তাঁর পর্যটক প্রতিনিধি করে নিউ ইয়রক আর মস্কো পাঠাতে চান। তার পরে চান লনডনে ভারতের হাই কমিশনার করতে। বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবরটা পেয়ে সুকুমার সপ্তে-সঙ্গেই লনডনে উড়ে যায়। মিলিকে ও রণকে মুস্তাফীদের হেফাজতে রেখে। মুরুব্বি না থাকলে বা লবিতে না ভিড়লে

দিল্লীতে কিছুই হবার জো নেই। হবার থাকলে হাই কমিশনারের ব্যক্তিগত অনুরোধে হবে। নয়তো ইনডিয়া হাউসেই মেনন ওকে কোনো এক চেয়ারে বসিয়ে দেবেন। ইনডিয়া অফিসের সঙ্গে লিয়াজঁ রক্ষা করতে।

মিলি এর পর থেকে জুলির সঙ্গে ঘন-ঘন দেখা করে। দুজনায় গলাগলি ভাব। একদা ওদের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারত, সুখী ভারত। যার জন্যে ওরা জীবন পণ করেছিল। সে স্বপ্নের কতটুকু বাস্তব হয়েছে? স্বাধীনতা যতই নিকটতর হচ্ছে পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ ততই বেড়ে যাচ্ছে। দেশ বোধহয় অখণ্ড থাকবে না, প্রদেশও খণ্ডিত হবে বোধহয়। আর সুখ? একজনও কি আছে যাকে সুখী বলতে পারা যায়? সর্বক্ষণ ভয়। মিলির মা বাবা ভয়ে-ভয়ে আছেন, প্রতিষ্ঠানও ভয়ে-ভয়ে চলছে। মিলি যদি এখানেই থেকে যায় ভয় নিয়েই ঘর করবে। জুলিই বা নির্ভয়ে থাকবে কী করে? নোয়াখালিতে কী হয়েছে শোনে নি?

নোয়াখালির বিবরণ খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হবার আগেই খুব সংক্ষিপ্ত আকারে সৌমার কানে আসে। সে সপ্তে-সঙ্গে রিলিফ নিয়ে নোয়াখালি অভি-মুখে রওনা হয়ে যায়। সেখানকার গান্ধীবাদী কর্মীদের সঙ্গে তার আগে থেকেই যোগাযোগ ছিল। বিবরণটা তাঁরাই পাঠিয়েছিলেন।

কলকাতার কাগজে লিখেছে পাঁচ হাজার হিন্দু খুন হয়েছে, তাদের সোনাদানা গোরু জরু লুট হয়েছে, বাড়িঘর পোড়ানো হয়েছে। যারা প্রাণ হারায় নি তারা ধর্ম হারিয়েছে। ধর্মস্থান হারিয়েছে। পালিয়ে বেঁচেছে আর ধর্ম বাঁচিয়েছে বিশ হাজার তিশ হাজার। সম্পত্তির ক্ষতি অপরিমেয়। জমি বেদখল হয়েছে। হিন্দুদের সমূলে উৎপাটন করাই পলিসি। এটা বেশ সুপরি-কল্পিতভাবেই সাধিত হয়েছে। সহসা ঘটে গেছে তা নয়। পেছনে মাথা আছে। অথচ মুসলিম লীগ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এসব ওঁদের কাজ নয়, ওঁদের কোনো শত্রুর কাজ। তার জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

সৌম্য এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করেছে। কাউকে দোষ দেয় নি। মুসলিম লীগকেও না, তার তথাকথিত শত্রুকেও না। সে সরেজমিনে তদন্ত করবে, তার তদন্তের ফল সরাসরি দিল্লীতে বাপুকে জানাবে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন ঘটনাস্থলে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ

করতে পারেন। তারপর ব্রিটিশ গভরনমেনটের গোচরে আনতে পারেন। ব্রিটিশ শাসন তো এখনো হস্তান্তর হয় নি।

বাপু যে এতদিন দিল্লীতে আটক রয়েছেন এটার কারণ মুসলিম লীগকে ইনটারিম গভরনমেনটের ভিতরে আনার জন্যে বড়লাটও সচেষ্ট, কংগ্রেসও সচেষ্ট, গান্ধীজীও সচেষ্ট। লীগের দিকে থেকেও সাড়া পাওয়া গেছে, কিন্তু শর্তে বনছে না। সেইজন্যে দেরি হচ্ছে। লীগ যেদিন গভরনমেনটে যোগ দেবে বাপু তার পরের দিনই নোয়াখালি অভিমুখে রওনা হবেন। ইতিমধ্যে লীগ একটা চমক দিয়েছে। তার জন্যে বরাদ্দ একটা আসন সে একজন হরিজনকে দিতে চেয়েছে। কংগ্রেস যদি একজন মুসলমানকে নিজের আসনগুলোর থেকে একটা দিতে পারে লীগও কেন একজন হরিজনকে নিজের আসনগুলোর থেকে একটা দিতে পারবে না? জিন্নাসাহেব স্বয়ং কোনো আসন চান না। বড়লাট দুঃখিত।

মোহিনীবাবুর মুখে মোনালিসার হাসি। সৌম্য সুধায়, "এর অর্থ কী, কাকা? হর্ষ না বিষাদ?"

তিনি চোখ বুজে বলেন, "একই সঙ্গে দুই। গত দু শো বছরের মধ্যে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথম পুরোপুরি ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হচ্ছে। বড়লাটকে বাদ দিলে সব কজন ক্যাবিনেট মেমবরই ভারতীয়। জগুলালাটেরও আসন নেই। তাঁর উপরওয়ালা সর্দার বলদেও সিং। এই পরিবর্তনটি সাত বছর আগে ঘটলে ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কত মধুর হত! এটা একটা বিস্ময়কর অগ্রগতি, যদিও বিলম্বিত। এখন গভরনমেনট অভ ইনডিয়া বলতে বোঝায় গভরনমেনট অভ ইনডিয়ানস। ব্রিটিশ আমলের পূর্বে যে আমল ছিল সে আমলের পাঁচশো বছরের মধ্যে হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুদেরই স্থান ছিল না। আকবরের রাজত্বই বোধহয় একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে জাহাঙ্গীরের দরবারেও হিন্দুদের প্রতিপত্তি ছিল। এখন হিন্দু মুসলমান শিখ খৃস্টান পারশি সবাইকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে। সবাই যদি ট্যাকস দেয় তো সবাই পাবে ট্যাকস ধার্য করার অধিকার। এরই নাম গণতন্ত্র। এরই নাম জাতীয় স্বাধীনতা। কত বড়ো পরিবর্তন! তার পর এটাও মনে রেখো। মুসলমানি আমলের আগে যতবার কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয়েছে ততবার শুধু উত্তর-ভারতীয়দের নিয়েই। দক্ষিণের লোকের তাতে কোনো অংশ ছিল না। তা হলে দেখছ আড়াই হাজার বছরে এই প্রথম উত্তর-দক্ষিণবাসীরা পাশাপাশি বসে ভারত শাসন করছে। তার পর আরো আশ্চর্যের কথা, আর্যশাসিত ভারতের সক্রিয় রাজন্যরা অনার্য বা অপৃশ্যদের পায়ের তলাতেই রাখতেন, মাথায় চড়তে দিতেন না। এখন দুজন অপৃশ্য মাথায় চড়ে বসেছেন। তাঁদের একজন তো সেকালে যাদের বলা হত চণ্ডাল। আরেকজন বোধহয় চামার। ব্রাহ্মণরা তাঁদের চেয়ে একটুও উঁচু নন। ক্ষত্রিয়-দের চেয়ে তাঁরা একটুও নীচু নন। একেই তো বলে সমাজবিপ্লব। সমাজবিপ্লব এ ছাড়া আর কী? ভারত-বর্ষের সমাজ শ্রেণীবিভক্ত নয়। বর্ণবিভক্ত। তিন হাজার বছরের ইতিহাসে এই প্রথম এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটল।"

সৌম্য স্বীকার করে। "তা হলে বিষাদ কেন?"

মোহিনীবাবু চোখ মিটমিট করে বলেন, "দ্যাখো, সৌম্য, সরকার গঠন করা যত না কঠিন তার চেয়েও কঠিন তাকে টিকিয়ে রাখা। সমবেত দায়িত্ব ছাড়া সরকার টেকে না। ঘোড়ার গাড়িতে চারটে ঘোড়া জুততে পারা যায়, কিন্তু চার ঘোড়া যদি চার দিকে দৌড়য় তবে গাড়ি ভেঙে খানখান হয়। মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার চালাবার জন্যে যোগ দেয় নি, বানচাল করবার জন্যেই ঢুকেছে। চালাবার উদ্দেশ্য থাকলে জিন্নাকে পাঠাত, নাজিম-উদ্দীনকে পাঠাত। তাঁদের বদলে পাঠিয়েছে রব্দি মালকে। তা দেখে বড়লাট পর্যন্ত স্তম্ভিত। তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুদক্ষ রাজনীতিক বা প্রশাসক নেই। এক লিয়াকৎ আলী খান বাদে। আর ওই যোগেন মণ্ডল কোন্ সুবাদে লীগ প্রতিনিধি বলে গণ্য হন? আসফ আলী সাহেবকে মুসলমান সমাজে হরিজনসদৃশ প্রমাণ করবার জন্যেই বাঙালি মুসলমানের আসনে বসানো হয়েছে। আসফ আলী সাহেব বহুদিনের পুরনো কংগ্রেসম্যান। তিনি জেলেও যান। ভারতের একমাত্র যৌথ নির্বাচনকেন্দ্র দিল্লী থেকে নির্বাচিত হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় গেছেন। বহু মুসলমান তাঁকে ভোট দিয়েছে। হিন্দুও।"

নোয়াখালি ঘুরে এসে সৌম্য বলে জুলিকে, "যত রটেছে তত ঘটে নি। অতিরঞ্জিত বিবরণ পড়ে বিহারী

হিন্দুরা অতিমাত্রায় প্রতিশোধ নিয়েছে। কী করি, বলো তো? আমার বাড়ি বিহারের দেহাতে। আমার মুসলমান ভাইবোনদের প্রতি আমার কি কোনো কর্তব্য নেই? কী তাদের অপরাধ? উদের পিণ্ডি কেন বুধোর ঘাড়ে পড়বে? ভাবছি বিহারে গিয়ে দেখি কী করতে পারি। তোমার আপত্তি নেই তো, লক্ষীটি?"

"সে কী কথা! তুমি বিহারের অন্নজলে মানুষ হয়েছ। তোমার প্রাথমিক কর্তব্য বিহারে গিয়ে হিন্দুদের শান্ত করা, মুসলমানদের অভয় দেওয়া। নোয়াখালির প্রতিশোধ বিহারী হিন্দুরা নিয়েছে, যেমন কলকাতার প্রতিশোধ নিয়েছে নোয়াখালির মুসলমানরা। এর পর কি পানজাবের মুসলমানরা নেবে বিহারের প্রতিশোধ? এই হিংসা-প্রতিহিংসার কি সীমা আছে না শেষ আছে? বাপু এ বয়সে ক-টা জায়গায় যাবেন? ক-টা দিক সামলাবেন? তিনি বুড়ো হয়েছেন। তোমরা তাঁর জোয়ান ছেলেরাই তো ছোটাছুটি করবে। পারলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতুম। কিন্তু কেন পারছি নে তা তুমি জান। যেটি আসছে ছোটাছুটি করে সেটিকে অকালে হারাতে চাই নে। আপত্তি নয়, অনুরোধ—আমাকে তুমি এখানে একলা ফেলে যেয়ো না, কলকাতায় মার কাছে রেখে যেয়ো।" জুলি বলে।

সৌম্য রাজি হয়। খবরটা শুনে মিলি ছুটে আসে ঝগড়া করতে। "এই মেয়ে, তুই তো আমার মায়ের কাছেই অনায়াসে থাকতে পারতিস। সেবাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে তোর মতো মেয়েদের সেবা করতে। আমি রয়েছি তোকে সঙ্গ দিতে। না, আমি লনডন ফিরে যাচ্ছি নে। দেশের স্বাধীনতা আমি প্রত্যক্ষ করতে চাই। দাঙ্গাহাঙ্গামাই তো শেষ কথা নয়। স্বাধীনতাই শেষ কথা। এর পরে যখন বিলেত যাব তখন স্বাধীন দেশের নাগরিকরূপেই যাব। ব্রিটিশ প্রজারূপে নয়।"

"আমি ভাই, ওসব এখন ভাবতেই পারছি নে। আমার বরের সঙ্গে এই প্রথম আমার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে। পারলে ওর সঙ্গে আমিও বিহারে যেতুম। দেশের মানুষকে আগে প্রাণে বাঁচতে দে। বেঁচে থাকলে তো স্বাধীনতার মুখ দেখবে। প্রাণের সঙ্গে-সঙ্গে মানও বাঁচাতে হবে। আচ্ছা, ভাই, মেয়েগুলোর কী অপরাধ? ওদের কেন ধরে নিয়ে যায়? যেমন নোয়াখালিতে তেমনি বিহারে। আমি তো লজ্জায় মরে যাচ্ছি। ক্রোধে জ্বলে উঠতে পারছি নে। কেন তা তুই জানিস। এ অবস্থায় জ্বলে ওঠা কি ভালো?" জুলি ব্যাকুলভাবে সুধায়।

"না, ভালো নয়। সাবধানে থাকিস আর রাখিস। শোন, আমি যা দেখেছি তা তুই দেখিস নি। মহাযুদ্ধ নয়, ছিঁচকে যুদ্ধ। তবু যুদ্ধ তো। যুদ্ধে কী না হয়? অল ইজ ফেয়ার ইন লাভ অ্যানড ওয়ার। খুনজখম, লুটতরাজ, ঘরজ্বালানো, নারীহরণ। সেকালে সীতাকেই উলটে সাজা দেওয়া হয়েছে। একালে আমরা বিপ্লবী কন্যারা সে অবিচার উলটে দিতে চাই। বিপ্লব বলতে বোঝায় ওলটপালট। অযোধ্যার লোকের ন্যায়-অন্যায়বোধের ওলটপালট ঘটাতে হবে। উদ্ধারের পর সীতাদের কলঙ্ক মুছে ফেলতে হবে। কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না। অগ্নিপরীক্ষা তো দূরের কথা। বনবাস তো কিছুতেই না। সসম্মানে পরিবারে আর সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। যাস নে, জুলি। তুই গেলে আমি কার কাছে বল পাব?" মিলি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত

মহাপ্রয়াণ

মিহির ভট্টাচার্য

বাবাজী দেহরক্ষা করবেন। তাঁর আত্মা মর্ত্যলোক ত্যাগ করে স্বর্গলোকে যাত্রা করবে। আজ সেই দিন। শ্রাবণ মাস, শনিবার, অমাবস্যা তিথি—এই যোগে তাঁর আত্মা দেহত্যাগ করে মরলোক থেকে অমরলোকে পৌঁছবে, এ কথা আজ থেকে বছর খানেক আগে বাবাজী নিজেই ঘোষণা করেছিলেন। এটা তাঁর ইচ্ছামৃত্যু নয়। তিনি বলেছিলেন—কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। পরমকরুণাময়ের ইচ্ছা আমি ফিরে যাই। সেইজন্যই আমার দেহে পাঁড়ার সঞ্চার হচ্ছে। আমার অসম্পূর্ণ কাজ মানবকল্যাণে সম্পূর্ণ করার জন্য তোমরা থাকবে। কথাগুলো তিনি বলেছিলেন শিষ্য-শিষ্যাদের সামনে, সান্ধ্য প্রার্থনাসভায়। সবাই বুঝেছিল—ইচ্ছামৃত্যু না হলেও বাবাজী সজ্ঞানে পরলোকে যাবেন এবং সেটা তিনি এখনই দেখতে পাচ্ছেন। অথচ তিনি নির্বিকার। কত বড়ো সিদ্ধি থাকলে গীতার শিক্ষার এরকম সার্থক ফললাভ সম্ভব।

কলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বাবাজীর আশ্রম। বাসে কলকাতা থেকে দু ঘন্টার কাছাকাছি সময় লাগে। প্রায় গঙ্গার ধারে এসে বাস-রাস্তাটা যেখানে বাঁ দিকে ঘুরে গেছে সেই মুখটাতে বাস থেকে নেমে রাস্তা পেরিয়ে ডান দিকে খোয়া-বাঁধানো পথ ধরে খানিকটা এগোলে উন্মুক্ত প্রান্তর, গাছ-গাছালি, প্রকৃতি ; তারই মাঝে অনেকটা জমি নিয়ে গঙ্গার তীর ঘেঁষে বাবাজীর আশ্রম। আশ্রমের নাম গীতাভবন।

আজ সকাল থেকেই আশ্রমের চত্বরে ভিড়। বাবাজীর শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা অসংখ্য নয়। অন্যান্য গুরুদের তুলনায় সামান্য। কিন্তু শিষ্য-শিষ্যারা প্রত্যেকেই শিক্ষিত এবং সম্পন্ন। সেইজন্য আশ্রমের ভেতরে এবং রাস্তার ধারে গাড়ির সারি পড়ে গেছে। অনেকে এখনও আসছে। প্রত্যেকের মুখেচোখে পরিশীলিত বিষণ্ণতা।

আশ্রমের সর্বত্র শিষ্য-শিষ্যারা দুজন বা তিনজন, খুব বেশি হলে চারজনের দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মৃদুস্বরে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছে। কারুর কোনো উচ্চ স্বর শোনা যাচ্ছে না। সবার কণ্ঠস্বর মিলে একটা গমগমে গুঞ্জন। নতুন যারা আসছে তারা ইতিমধ্যে এসে-যাওয়া শিষ্য-শিষ্যাদের কাছ থেকে খবরাখবর নিয়ে যে যার মতো জায়গা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করছে—কখন আসবে সেই মহাপ্রয়াণের লগ্ন।

বাবাজীর আশ্রমভবনটি বেশ সুন্দর। চারপাশে খোলা-

মেলা জমি। একদিকে গঙ্গার বিস্তার। অপর সব দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। আশ্রমের নিজস্ব জমি কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়ার দরজা পেরিয়ে ঢুকলে পাথর-নুড়ি-বিছানো পায়ে-চলা পথ। পথটি সমগ্র আশ্রমভবনকে বেষ্টন করে রয়েছে। পথের দু পাশে কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। আশ্রমভবন থেকে বেশ খানিকটা দূরে, আশ্রমের জমির প্রান্ত ঘেঁষে নানারকম গাছের সারি। শুধু গঙ্গার দিকে কোনো গাছ নেই। মাঝখানের ফাঁকা জমিতে নানা-রকম সবজির চাষ।

আশ্রমভবনের মেঝে মাটি থেকে উঁচুতে। তিন ধাপের সিঁড়ি করে দেওয়া আছে চার দিকে। সিঁড়িগুলি পাথর-বাঁধানো। সিঁড়ি পেরোলেই চারদিকে ঘোরানো চওড়া উন্মুক্ত বারান্দা। বারান্দা পেরিয়ে সরাসরি বিশাল প্রার্থনা-ঘর। প্রার্থনাঘরের এক প্রান্তে গর্ভগৃহ, সেখানে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি। মূর্তি পূর্বমুখী।

গর্ভগৃহের সামনে একটি বহুমূল্য পালঙ্কের উপর উপযুক্ত দামি বিছানায় বাবাজী শুয়ে আছেন। সেটাই তাঁর ইচ্ছা। তিনি ভগবান বিষ্ণুর সামনে দেহরক্ষা করতে চান। তাঁর অপর ইচ্ছা হল তাঁর দেহভস্ম গয়ায় ভগবান বিষ্ণুর পাদপদ্মে যেন অবশ্যই সমর্পণ করা হয়।

আশ্রমভবনের দক্ষিণভাগে একখানি প্রশস্ত ঘর। সেই ঘরের সন্নিকটে মন্দিরভবন থেকে সামান্য দূরে একখানি ছোটো টালির ঘর সমগ্র পরিবেশের সৌন্দর্যকে বিঘ্নিত করছে। ঐ ঘরটি বাবাজীর ইহলৌকিক খাস সেবক বিষ্ণুচরণের। দক্ষিণভাগের প্রশস্ত ঘরটি বাবাজীর নিজস্ব। এ ছাড়াও আশ্রমভবনের উত্তর-পশ্চিম ভাগে কয়েকটি ঘর আছে। সেগুলিতে আশ্রমসেবক শিষ্যরা থাকে। এরা সকলেই গৃহত্যাগী। আশ্রমে কোনো শিষ্যা থাকে না। বাবাজীর নির্দেশ।

বাবাজীর সেবক বিষ্ণুচরণের মন বেশ কিছুকাল যাবৎই খারাপ। ওর মনে অশান্তি এক বছর ধরে। গত কর্দিন বাবাজীর দেহপীড়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় ওর মন ষৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ। প্রধান-প্রধান শিষ্য-শিষ্যারা সকাল থেকে বাবাজীকে ঘিরে রয়েছে। আজকের সেবা-শুশ্রূষা যা কিছু তারাই করছে। বিষ্ণুচরণ বাবাজীর শয্যার কাছাকাছি যেতে পারছে না। ফলে কর্মশূন্য। শিষ্য-শিষ্যারা আজ ওর অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে চাইছে না।

বিষ্ণুচরণ বাবাজীর শিষ্য নয়, আশ্রমের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। ওর আসল নামও বিষ্ণুচরণ নয়। প্রায় বছর কুড়ি আগে মেদিনীপুরে বন্যার্তদের ত্রাণে গিয়েছিলেন বাবাজী। সেইখানে জলস্রোতে ভাসমান বিপন্ন প্রায় অর্ধচেতন বছর দশেকের বালক বিষ্ণুচরণকে উদ্ধার করেন বাবাজী। ছেলেটির মা-বাবা, আত্মীয়-পরি-জন কারোর কোনো হদিশ করতে পারেন নি তিনি। ছেলেটি নিজের নাম বলেছিল নীলরতন গুণে। কদিন সেবা-শুশ্রূষা যত্ন-আত্তি পেয়ে ছেলেটি চাঙ্গা হয়ে উঠল। ওর যাবার কোনো জায়গা নেই দেখে বাবাজী ওকে নিজের দলের সঙ্গে রেখে দিলেন। হাতের কাছে লোক থাকলে যা হয়—কখন সকলের বেখেয়ালে টুকটাক ফাইফরমাশ খাটতে-খাটতে নীলরতন বাবাজীর একান্ত প্রয়োজনীয় অবলম্বন হয়ে গেল। বাবাজীর ওর নাম পালটে করে দিলেন বিষ্ণুচরণ।

আজ উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা ছাড়া বিষ্ণুচরণের কোনো কাজ নেই, কোনো ভূমিকা নেই, কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ অন্যান্য দিন ওর কত কাজ, কত গুরুত্ব। সকাল থেকে বাবাজী ওকে এক-একটি নির্দেশ দিতেন। ও সেই নির্দেশ প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিত। যাকে বাবাজী ডেকে পাঠাতেন তাকে ডেকে আনত। ওর কোনোদিনই এই আশ্রমে স্বাধীন কোনো অধিকার নেই। ওর গুরু-ত্বের একমাত্র কারণ বাবাজীর কাছে ওর অবারিত দ্বার। আশ্রমের সেবক-শিষ্য বা অন্যান্য প্রভাবশালী শিষ্যাদেরও বাবাজীর দর্শন প্রার্থনা করতে হত। কিন্তু বিষ্ণুচরণ যে-কোনো সময় কিছু না বলে বাবাজীর শয়নকক্ষে পর্যন্ত ঢুকে পড়তে পারত।

কাজের অভাবে, কেউ ওকে কিছু বলছে না বা পাত্তা দিচ্ছে না—তার জন্য যে বিষ্ণুচরণের মন খারাপ, তা নয়। বাবাজীর আশ্রমত্যাগ কথা ভেবে ও উদ্বিগ্ন। আশ্রমের ভবিষ্যৎ যে কী দাঁড়াবে ঠিক নেই। বিষ্ণুচরণ খুব ভালো করেই জানে বছরখানেক আগে বাবাজী মৃত্যুতিথি ঘোষণা করার পর আশ্রমের কর্তৃত্ব লাভের জন্য শিষ্যাদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়ে গেছে। একদিকে রয়েছেন অন্যতম আশ্রমসেবক ও বাবাজীর প্রিয়পাত্র সদ্-বিষ্ণুজী আর তাঁর সমর্থকরা, আরেক দিকে রয়েছেন গৃহী শিষ্য আর বাবাজীর অর্থকরী ভরাসস্থল মোহন বাঁড়ুয্যে আর তাঁর সমর্থকরা। মোহন বাঁড়ুয্যে সদ্-

বিষ্ণু মহারাজকে বাদ দিয়ে আশ্রমসেবক নয়জনের যে-কোনো একজনকে আশ্রম-প্রধান করতে রাজি আছেন।

আজও শিষ্যাদের জটলা আর নীচুস্বরে আলাপের টুকরো-টাকরা বিষ্ণুচরণের কানে ভেসে এসেছে। শিষ্যা-রা নিজেদের মধ্যে আশ্রম-প্রধাননের পদ কার পাওয়া উচিত তাই নিয়ে খুব মার্জিত অথচ তীব্র অনড় মতামত ব্যক্ত করছে। এই বিরোধ-বিতর্কের সবচেয়ে বড়ো কারণ হল —বাবাজী আজও পর্যন্ত কথায় বা লিখিতভাবে এ সম্পর্কে তাঁর মতামত কখনও কাউকে জানতে দেন নি। যেহেতু তিনি সদ্‌বিষ্ণুজীকে পছন্দ করতেন সেইজন্য শিষ্যাদের এক বিরাট অংশ তাঁর পক্ষে চলে গেছে। কিন্তু মোহন বাঁড়ুয্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছাটা কম বড়ো ব্যাপার নয়। আশ্রমের সকলেই বুঝে গেছে সদ্‌বিষ্ণুজীর ওপর তাঁর ব্যক্তিগত রাগ রয়েছে। কেন কেউ জানে না। এই রাগের কথা বাবাজী বেঁচে থাকতেও সকলে জানত। বিষ্ণুচরণ বাবাজীর কাছ থেকে একবার জানার চেষ্টা করেছিল। বাবাজী ওর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে খুব ধীরে ধীরে বলেছিলেন—কারো কাছে কখনও এ নিয়ে আলো-চনা করবি না। মোহন বড্ড ক্ষমতাপ্রিয়। আবার ওকে বাদ দিলে আশ্রমের অনেক ক্ষতি। এই মুহূর্তেও বিষ্ণুচরণ অবাক হয়ে ভাবছে—বাবাজী আশ্রম-প্রধান করার ব্যাপারে কোনো নির্দিষ্ট মতামত দিয়ে গেলেন না কেন।

বিষ্ণুচরণের অপর দুশ্চিন্তাটা একেবারেই ব্যক্তিগত। মাঝে-মাঝেই ও ভাবছে—বাবাজী যদি আজ মারা না যান! বন্যার হাত থেকে ওর ত্রাণকর্তা বাবাজীকে বিষ্ণু-চরণ একদিনে ভালোবাসে নি। উনি তিলে-তিলে ওর মনে গভীর শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। মানুষ হিসেবে, আচার-আচরণে বাবাজী সত্যিই সাধুপুরুষ। বিষ্ণুচরণ আজও পর্যন্ত তাঁর কোনো নিন্দনীয় আচরণ দেখে নি। বৈরাগ্যের নামে ভোগ তিনি করেন না। পরিধেয়, আহার, ব্যবহার—সবকিছুতেই তিনি সাত্ত্বিক। সমদর্শী বাবাজী ধনী বা গরিব শিষ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি কোনোদিন। তিনি কারো সঙ্গে কোনো দিন রূঢ় ব্যব-হার করেন নি। সিদ্ধ এই মহাত্মার কোনো কথাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে দেখে নি বিষ্ণুচরণ। কিন্তু আজ যদি তাঁর নিজের মৃত্যু-সম্পর্কিত উক্তি ব্যর্থ হয় তাহলে কী ঘটবে? লোকের মনে তাঁর যে উচ্চাসন তা তো থাকবে না! ও নিজেই কি বাবাজীকে আর দেবতার মতো শ্রদ্ধা করতে পারবে!

বিষ্ণুচরণ চিন্তার জাল ছিঁড়ে সচেতন হল। নিজের মনেই মাথা নেড়ে বলল—না, বাবাজীর কথা কখনোই ব্যর্থ হতে পারে না। উনি আজ দেহরক্ষা করবেনই।

ও বারান্দায় সমবেত শিষ্যাদের দিকে একবার তাকাল। সবাই একই রকম ভাবে আলাপে তৎপর, একই রকম ভাবে অপেক্ষমান। ওকে কেউ চেনার লক্ষণও দেখাচ্ছে না।

বাবাজীর অবর্তমানে আশ্রমে ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিষ্ণু-চরণের কোনো ভাবনা নেই। বাবাজী যেদিন তাঁর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করেছেন সেদিন থেকেই নিজের ব্যাপারে ও সচেতন হয়েছে। বাস-স্টপের কাছে একটা চায়ের দোকান আছে। সেটা চালায় নিতাই। বড়ো ঠেকে গিয়ে নিতাই ওকে অংশীদার করে নিয়েছে। এ খবর বাবাজী জান-তেন। তিনি ওকে টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছেন।

শিষ্যাদের দিকে আরেকবার তাকিয়ে ও উঠে প্রার্থনা-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। প্রার্থনাঘরেও শিষ্য-শিষ্যাদের ভিড়। বাবাজীর চারধারে রয়েছেন আশ্রমসেবক শিষ্যারা। সদ্‌বিষ্ণুজী বাবাজীর মাথার দিকে বসে আছেন। তাঁকে খুব ক্লিষ্ট দেখাচ্ছে। বাবাজীর প্রতি ওঁরও আকর্ষণ খুবই তীব্র। বিষ্ণুচরণ কি বারান্দায়, কি প্রার্থনাঘরে—কোথাও মোহন বাঁড়ুয্যেকে দেখতে পেল না। ও ধীর পায়ে আশ্রমবাড়ির আঙিনা ছাড়িয়ে ফটক দিয়ে বেরিয়ে বাস-রাস্তার দিকে এগোতে লাগল।

সকাল থেকে নিষ্কর্মা কাটলেও বেলা অনেক হয়েছে। সূর্য অপরাহ্ণে। মন বিষণ্ণ আর চিন্তাগ্রস্ত থাকায় স্বাভা-বিক সময়ে খিদে না পেলেও এখন বিষ্ণুচরণের পেটে মোচড় দিচ্ছে। নিতাই খাওয়া-দাওয়া সেরে এতক্ষণে দোকানে ফিরে নিশ্চয়ই একটু গড়িয়ে নিচ্ছে। সে'কা পাঁউরুটি আর চা দিতে পারবে।

আজ আর নিতাই গড়ায় নি। দোকান পুরো দস্তুর খোলাই রেখেছে। ও বিষ্ণুচরণের থেকে বছর কয়েকের বড়ো। ওকে দেখতে পেয়ে নিতাই উদ্বেগের স্বরে বলল —কোনো খবর হল বিষ্টুদা?

বিষ্ণুচরণ মাথা নেড়ে একটা বেঞ্চিতে বসল। তারপর যতটা সম্ভব স্বাভাবিক গলায় বলল—এক কাপ চা আর

দুখানা রুটি সেঁকে দাও তো, নিতাইদা। বড্ড খিদে পেয়েছে!

চায়ের দোকানে বসে থাকতে-থাকতেই মোহন বাঁড়ুয্যের গাড়ি আশ্রমের দিকে ঢুকল। পেছনের সিটে মোহন বাঁড়ুয্যে আর একজন ভারিক্কি চেহারার লোককে দেখতে পেল বিষ্ণুচরণ। গাড়িটাকে আশ্রমের দিকে যেতে দেখে নিজের মধ্যে ও একটা অস্থিরতা অনুভব করল। তাগিদ অনুভব করল আশ্রমের দিকে যাওয়ার। পরক্ষণে আবার নিজের মনেই হতাশ হয়ে ভাবল—বাবাজীর দেহান্ত হলে আজই হয়তো আশ্রমের সঙ্গে ওর সব সম্পর্ক ঘুচে যাবে। তাতে সদ্‌বিষ্ণুজীর দল জিতুক আর মোহন বাঁড়ুয্যের দল জিতুক, ওর কিছু যায় আসে না।

বিষ্ণুচরণ অনেকক্ষণ নিতাইয়ের দোকানে বসে রইল। বেশির-ভাগ সময়টাই চুপচাপ। দু-চার জন ওর কাছে বাবাজীর খবর জানতে চেয়ে হুঁ-হাঁ ছাড়া উত্তর পেল না। অনেকে আবার আজকের দিনে ওকে নিতাইয়ের দোকানে বসে থাকতে দেখে অবাক চোখে তাকাতে-তাকাতে চলে গেল। বসে থাকতে-থাকতে বিকেল গড়াল। প্রায় সন্ধের মুখে বিষ্ণুচরণ আশ্রমের দিকে পা বাড়াল।

আশ্রমের ফটক পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে ও অনুভব করল একটা থমথমে আবহাওয়া। প্রার্থনাঘরের ভেতরে বাইরে বেশ উত্তেজনা। উত্তেজনার বিকট প্রকাশ না থাকলেও সকলের মুখেই একটা অনড় সংকল্পের ছাপ। প্রার্থনাঘরে বাবাজীর কাছে সদ্‌বিষ্ণুজী একইভাবে বসে আছেন। তিনি একদৃষ্টে মহাত্মার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর দিকে তাঁর প্রধান-প্রধান সমর্থকরা ভিড় করে অথচ সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবাজীর অপর দিকে মোহন বাঁড়ুয্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাশে ভারিক্কি সেই ভদ্রলোক। মোহন বাঁড়ুয্যের তিন দিকে তাঁর সমর্থকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে বাবাজী একইভাবে বিষ্ণুমূর্তির দিকে মাথা করে শায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রাণস্পন্দন আগের মতো একই রকম।

বারান্দায় গুঞ্জনরত শিষ্য-শিষ্যাদের টুকরো কথা থেকে বিষ্ণুচরণ বুঝতে পারল—মোহন বাঁড়ুয্যের সঙ্গে যিনি এসেছেন তিনি কলকাতা শহরের বিখ্যাত ডাকতার। তিনি বাবাজীকে পরীক্ষা করতে গেলে প্রবল অশান্তির সৃষ্টি হয়। মোহন বাঁড়ুয্যে বাবাজীর দেহ ডাকতার দ্বারা পরীক্ষা করাবেনই আর সদ্‌বিষ্ণুজী কিছুতেই তা করতে দেবেন না। তাঁর বক্তব্য—যে মহৎ আত্মা ইহলৌকিক কর্মসমাপনান্তে পরলোকে যাত্রার দিনক্ষণ পূর্বেই নির্দিষ্ট করে বলে দিতে পারেন তাঁর দেহ শেষমুহূর্তে ডাকতারি পরীক্ষার দ্বারা কলুষিত করার প্রয়োজন নেই। এ তো আর সাধারণ দেহপীড়া নয়!

এই বিতর্কে দুই পক্ষ যুযুধান রূপ নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ওই বড়ো ডাকতারবাবুই মোহন বাঁড়ুয্যের দলকে সংযত করে নিয়েছেন। তিনি বুঝিয়েছেন—পরীক্ষা করলেই তো হবে না। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। আজ রাত বারোটা পর্যন্ত দেখাই যাক। তার মধ্যে যদি উনি দেহত্যাগ না করেন তাহলে যা করার করা যাবে।

ডাকতারবাবুর প্রস্তাবে সদ্‌বিষ্ণুজীর দলও আপত্তি করে নি। বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল—আজকের অমাবস্যা তিথিতে তিনি দেহত্যাগ করবেন। আজ রাত্রি এগারোটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত অমাবস্যা, তারপর প্রতিপদ।

এখন সবাই বাবাজীর দেহভাবের দিকে, মুখভাবের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে কোনো বৈলক্ষণ ধরা পড়ে কি না। কিন্তু কোনো বৈলক্ষণ নেই। বাবাজী যেন নিশ্চিন্ত ঘুমোচ্ছেন।

ক্রমে রাত্রির অন্ধকার নেমে এল। মহা অমাবস্যার এই রাত্রির অন্ধকার যথার্থই নিশ্ছিদ্র। প্রথম যামেই শিয়ালের ডাক রাত্রির ভয়ংকরতা বাড়িয়ে দিল। সন্নিকটবর্তী গঙ্গা অন্ধকারে নিমজ্জিতা। প্রান্তরে জোনাকির আলো অন্ধকারের ভয়ংকরতা বাড়িয়ে দিয়েছে। শিষ্য-শিষ্যাদের অধিকাংশই যে যার জায়গায় বসে পড়েছে। প্রার্থনাঘরেও সকলে এখন উপবিষ্ট। এমন-কি মোহন বাঁড়ুয্যে এবং তাঁর সঙ্গী বড়ো ডাকতারও।

বিষ্ণুচরণও বারান্দার একটি থামে হেলান দিয়ে বসে পড়েছে। সারাদিনের উদ্বেগ, অশান্তি, উত্তেজনা, অনাহার আর অস্নানের ফলে সে এখন ক্লান্ত, অবসন্ন। থামে হেলান দিয়ে বসে অচিরেই সে আধো-সুপ্তি-আধো-চেতনার জগতে চলে গেল। মাঝে-মাঝে দু-চারটে মশার উপদ্রব ঠেকাবার জন্য হাত-পা নাড়তে লাগল। এমনি অবস্থাতেই বিষ্ণুচরণ এক সময় নিদ্রার অচৈতন্যে চলে গেল।

একটা হৈ-হৈ শব্দে বিষ্ণুচরণ ধড়ফড় করে উঠে বসল। চোখ ডলে ভালো করে তাকিয়ে দেখে বাবাজীর শিষ্য-শিষ্যারা সকলেই খুব উত্তেজিত। ও সময়টা ঠাহর করার চেষ্টা করল। মধ্যরাত। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার। আকাশের তারাগুলি সেই অন্ধকারের গাঢ়তা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

মোহন বাঁড়ুয্যের গলা শুনতে পেল বিষ্ণুচরণ। উনি ব্যস্তভাবে কাকে নির্দেশ দিচ্ছেন—ভ্যানটাকে এদিকে নিয়ে এসো। ছোটো পালঙ্কটায় বাবাজীকে শোয়ানো হয়েছে তো!

বিষ্ণুচরণ লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। তাহলে কি সব শেষ! ও প্রার্থনাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সদ্‌বিষ্ণুজী বিষণ্ণভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্যান্য আশ্রমসেবক শিষ্যরা একটি ছোটো পালঙ্কের ওপর বাবাজীকে শুইয়ে দিচ্ছে। বাবাজীকে শুইয়ে দেবার পর মোহন বাঁড়ুয্যের সঙ্গী বড়ো ডাকতারবাবু নাড়ি পরীক্ষা করলেন, স্টেথিসকোপ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস দেখলেন। তারপর মৃদুস্বরে মোহন বাঁড়ুয্যেকে কী বললেন।

বিষ্ণুচরণ আবার মোহন বাঁড়ুয্যের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—বাবাজীকে খুব সাবধানে তুলবে। ওঁর অবস্থা খুব দুর্বল। দুপুরবেলা হাসপাতালে নিতে পারলে আর এত চিন্তা থাকত না। বলে তিনি কটাক্ষে সদ্‌বিষ্ণুজীকে দেখলেন। উনি তেমনি বিষণ্ণবদনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছেন।

মোহন বাঁড়ুয্যের কথা শুনে বিষ্ণুচরণ একটা ধাক্কা খেল। নিজের মৃত্যু সম্পর্কে বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ বৃথা হয়েছে। প্রথম ধাক্কায় ও ঠিক করে উঠতে পারল না—আনন্দিত হবে না বিমর্ষ। শুধু সদ্‌বিষ্ণুজীর মুখের দিকে তাকিয়ে ও বুঝেছে—এখন রাত্রি বারোটা পেরিয়ে গেছে।

তারপরেই বিষ্ণুচরণের নিজেকে বড়ো অসহায় মনে হল। তার অবলম্বনের ভিত্তিমূল কে উপড়ে ফেলেছে। তার মনের জোর, শরীরের শক্তি সব যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল। নিশি-পাওয়া লোকের মতো আলোকিত আশ্রম ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল বিষ্ণুচরণ। পা বাড়াল নিতাইয়ের দোকানের দিকে। কিন্তু সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার।

ঢোলগোবিন্দ-র আত্মদর্শন

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

১০

দর্শনা, আমার দর্শনা

এই যাঃ, আমার জেরার চোটে বুড়োটা টেঁসে গেল নাকি? কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলি : ও ঢোল-গোবিন্দ! ও ঢোলগোবিন্দ!

ঢোলগোবিন্দ নড়েও না, চড়েও না।

ইদানীং এমন উলটোপালটা বলছিল। শুনে তখনই বোঝা উচিত ছিল ওর হয়ে এসেছে।

এদিকে আমি কলমটলম বাগিয়ে উনুনে হাঁড়ি চড়িয়ে বসে আছি। একবার মুখ ফসকে ব'লে ফেলেছি, 'আহা, মরণের কী আমার ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন!'

আর যায় কোথায়! হঠাৎ শুনি : 'দর্শনা'। 'দর্শনা'। ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।

দর্শনা।

অজ পাড়াগাঁর সেই ছোট্ট স্টেশন। প্যাসেনজার ট্রেন ছাড়া আর কিছুই সেখানে থামে না।

ট্রেন থেকে নামে শুধু ঢোলগোবিন্দরা কজন। প্ল্যাটফরম ফাঁকা। পুবে টিমটিম করে ছোট্ট একটু রেল-বাজার। আমরা যাব লাইন পেরিয়ে পশ্চিমে।

ছোটো-ছোটো এই যে সব ইস্টিশান, একটার সঙ্গে আরেকটার কোনো ফারাক নেই। সব এক ছাঁচে ঢালা। শুধু নামেই যা তফাত।

স্টেশনে গোরুর গাড়ি নিয়ে আসত—পেটে আসছে মুখে আসছে না—জাবেদচাচা। আবার একটা নাম ঢোলগোবিন্দ নির্ঘাত বানিয়ে বলল। বলুক। নাম বই তো নয়। নামে কী আসে যায়!

শুধু নাম? কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে, আছে নাকি ওর সে খেয়াল? সনতারিখের ধার ধারে না। এদিকে কী আব্বা!

তো জাবেদচাচা। জোয়ান বয়েস অবধি দেখে এসেছে দর্শনায় নেমে প্রথম হাসিমুখ জাবেদচাচার। চাচার কোলে চড়ে যখন রেললাইন পার হত, তার পেটে তখন ভুঁড়ির খাঁজ ছিল না। ফলে, তার ঘেমো গায়ে অনবরত পিছলে যেত।

সেই জাবেদচাচা পরে চেহারাটি যা বাগাল। ইয়া ভুঁড়ি। চোখদুটো লাল-লাল। লুঙ্গির ওপর সেই গামছা বাঁধা। কিন্তু গা যেমন তেল-চকচকে, লুঙ্গিরও কী চেকনাই।

দেশে আমরা যেতাম ছুটি-ছাটায়। ঠাকুরদা চলে যেতেন আগে-আগে। আমরা কবে আসছি চিঠিতে তা জানবামাত্র জাবেদচাচার কাছে খবর চলে যেত। যাবার আগে ঠাকুরদার কাছ থেকে বসবার সতরঞ্চি নিয়ে যাওয়া ছিল দস্তুর।

জাবেদচাচার তো আর সওয়ারি বওয়ার গাড়ি নয়। ওতে হয় মাল আনা-নেওয়ার কাজ। তবু বাড়িতে তার একটা ছই ছিল। গোলার গায়ে সেটা হেলান দেওয়া থাকত।

স্টেশন থেকে আমাদের আনার আগে গাড়ির ওপর ছই তুলে খড় বিছিয়ে তাতে সতরঞ্চি পাতা হত। হলে হবে কী। গোরুর গাড়িতে চড়া যে কী পেড়ার বলার নয়। ঝাঁকিয়ে-ঝাঁকিয়ে বাবার নাম ভুলিয়ে দেবে। স্টেশন থেকে লোকনাথপুর কতটুকুই বা রাস্তা। দেড়-দু ক্রোশের বেশি নয়। সারা রাস্তা নাচতে-নাচতে চলো। বারো মাস রাস্তার চেহারা যেন চষা ভুঁইয়ের মতন। বর্ষায় মাটি যেন চিটে গুড়, আর শীতে ধুলো উড়বে কুয়াশার মতন।

গাড়ি চড়ার মজাও যে ছিল না তা নয়। এক তো জাবেদচাচার টাকরা আর আলটাকরায় জিভ ঠেকিয়ে বিচিত্র সব আওয়াজ করে হুকুম দাবড়ানো। কিংবা গোরু দুটোর ঝিম ধরলে পাঁজরে গুঁতো মেরে কিংবা ল্যাজ মুড়ে দিয়ে দুদ্দাড়িয়ে ছোটানো। সেসব কত কায়দা।

আর বেশ ছায়ায়-ছায়ায় যাওয়া যেত। রাস্তার দুপাশে তখন গাছ ছিল কত। ডালে বসে ডাকত কত রকমের পাখি।

জাবেদচাচাকে তো সে কম দিন দেখে নি। ঠাকুরদার প্রজা। সেই সুবাদে খাজনাটা গাড়ি চড়াতেই শোধ হয়ে যেত। মা অবশ্য জাবেদচাচাকে জল খেতে দিতে কখনও ভুলতেন না।

মোট কথা, জাবেদচাচা আমাদের বেশ পছন্দই করত।

আমাদের গ্রামটা ছিল শুকনো খটখটে। ঝোপঝাড় বিশেষ ছিল না। ডোবাপুকুরের পাট না থাকায় ধোপারও পাট ছিল না। দক্ষিণে ছিল মরা নদীর একটা খাত। সেখানে হত ধান আর আখের চাষ।

একটু বড়ো হয়ে গোরুর গাড়িতে আর উঠি নি। তখন আমি আর দাদা রামনগর থেকে নলগাড়ির ওপর দিয়ে আলে-আলে এসে ঠেলে উঠতাম কলমের আম-বাগানে। বাগানে বেড়ার কোনো বালাই ছিল না। তবে গাছেরা আমি গাছের তুমি যথেষ্টই ছিল। কার কোন্‌টা সেটা নাম দিয়ে চিহ্ন করা থাকত। আমাদের ছিল পাছা-বেঁকা, মধু-কুলকুলি। তবে যে পাড়ত সেই খেত।

আম পাড়া হত ঢিলিয়ে নয়। হয় গাছ উঠে, নয় এড়ো মেরে। এড়ো বলতে ডালভাঙা ছোটো-ছোটো হেতের। তেমন করে ছুঁড়তে পারলে এক ঘায়ে দুটো তিনটে পড়ত।

জল বলতে গ্রামের উত্তরপ্রান্তে ছিল বিল। আমা-দের চোখের সামনে একদিন সেই বিল শুকিয়ে গেল।

বিলের পুবশিয়রে ছিল একটু উঁচু টিবিমতন জায়গা। আগে নাকি সেখানে ছিল নীলকরদের কুঠি। ঝোপঝাড়ের মধ্যে কিছু ভাঙা ইঁটকাঠ ছাড়া আমরা তার কিছুই দেখি নি।

সেই টিবি পেরিয়ে আমরা যেতাম ডুগডুগির হাটে। সেটা ছিল খাঁ-খাঁ-করা একটা জায়গা। গা ছমছম করত বলে হাট থেকে আমাদের বেলাবেলি ফিরতে হত।

হঠাৎ সেখানে লোকে এসে আস্তানা গাড়তে লাগল। জাবেদচাচার একদিন কী করে কপাল ফিরল কে জানে। ওখানে এসে চারদিকে কচাগাছের বেড়া দিয়ে টিনের চালের একটা বাড়ি তুলল। বামুনপাড়ার লোকে বলতে লাগল, 'ওই জাবেদ তো। জানা আছে। ওর যে এখন অত বিষয়-আশয়, সব তো ডাকাতি থেকে।'

আমাদের কাছে জাবেদচাচা কিন্তু সেই রকমেরই থেকে গিয়েছিল। ঠাকুরদার সামনে কখনও গলা তুলে কথা বলত না। স্টেশনে যেতে, স্টেশন থেকে আসতে আমাদের বরাবরের নির্ভর সেই জাবেদচাচা। হাট থেকে ফেরার পথে গড়ডুমড়ি না খাইয়ে ছাড়ত না।

জাবেদচাচা কি ডাকাত ছিল? হবেও বা। চোখ-দুটো ওর লাল ছিল। কেন? রাতে ঘুমত না বলে?

ঢোলগোবিন্দর ঠাকুরদার দাদামশাইয়ের অবস্থা কেমন ছিল জানি না। তবে বাড়িটা ছিল তিনমহলা। এক

সময়ে দোতলাতেও ঘর ছিল। সেসব অনেকদিন সাফ। দক্ষিণের মহল ভেঙে পড়েছিল অনেক কাল আগে। উত্তরে শেষ পর্যন্ত ভাঙো-ভাঙো হয়ে টিঁকে ছিল এক-দেড়খানা ঘর। সেখানে থাকত এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবার। সে বাড়ির ছেলে করুণাদা আর দয়াময়।

করুণাদার বাবাকে আমরা বলতাম জ্যাঠামশাই। তাঁর চুল সাদা হওয়ার ঢের আগেই দাঁতগুলো সবই পড়ে গিয়েছিল। জেঠিমাকে দেখে কেন জানি না খুব কষ্ট হত। গায়ের রঙ ফরসা, কিন্তু রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা। হাতে শুধু সাদা শাঁখা।

জ্যাঠামশাইয়ের মাথায় ছিল টিকি। জলচৌকিতে বসে স্নান করার সময় আমাদের শুনিয়ে-শুনিয়ে খুব মন্ত্র আওড়াতেন আর দেখিয়ে-দেখিয়ে মাথার চুটকির খুব কেয়ারি করতেন।

জ্যাঠামশাইয়ের ছিল যজমানি পেশা। বাড়িতে থাকতেন খুব কম। হঠাৎ-হঠাৎ শিষ্যবাড়ি থেকে সিধে নিয়ে ফিরতেন।

ছুটিতে মা এলে এবং জ্যাঠামশাই না থাকলে, জেঠিমা খানিকটা আশ্বস্ত হতেন। চালে ডালে টান পড়লে মা-র হাতে পড়ে ঠিক কুলিয়ে যাবে।

জ্যাঠামশাইয়ের ছিল গাঁয়ের লোককে তাক লাগাবার জন্যে যেমন তেমন কথায় অনুস্বর বিসর্গ লাগানো। শুনে দাদা হাসত।

করুণাদা পেয়েছিল খানিকটা জ্যাঠামশাইয়ের ধাত। বাবার সঙ্গে কোথায় কোন্ শিষ্যবাড়িতে গিয়ে কবে কী খেয়েছে, কী-সব ধনদৌলত দেখেছে—করুণাদা বলত সেই-সব রাজাউজিরমারা গল্প।

সব বিশ্বাস না করলেও, বলার গুণে আমরা সব হাঁ হয়ে শুনতাম।

দক্ষিণের মহলটা পাঁচিলসুদ্ধু পড়ে গিয়েছিল আমাদের জন্মেরও ঢের আগে। ইঁটের ধ্বংসস্তূপটা তখন সাপখোপের বাসা।

যত বিষধর সাপ বেছে-বেছে ঠিক জ্যাঠামশাইদের বাড়িতেই আসত। হয়তো ভাঙাচোরা আর ফাটাফুটো ও-বাড়িতেই বেশি ছিল বলে। কিংবা জ্যাঠামশাই সর্ষে-পড়া সাপের-মন্ত্র এসব নিয়ে বেশি বারফাট্টাই করতেন বলে।

পরে মেজোকাকা একবার ছুটি নিয়ে এসে ভেতরের ঘ্যাঁসগুলো সরিয়ে সেরেসুরে চুনকাম করিয়ে বাড়িটার চেহারা ফিরিয়েছিলেন। বাইরের পুজোর দালানটাতে শুধু হাত পড়ে নি। পুরনো ভাঙাচোরা দশাই তার থেকে গিয়েছিল।

বামুনপাড়ায় বাড়ি সাকুল্যে তিনটে। আমাদের পাশের বাড়িটা ডুন্ডুকাকাদের। ছোটো ভাই মোনা ছিল আমার বয়সী। ডুন্ডুকাকা কাজ করত রেলে। থাকত কাঁচড়া-পাড়ায়। হপ্তায়-হপ্তায় আসত। সন্ধের পর যে বাতিটা নিয়ে ওরা বাড়ির বার হত, সে বাতি আসলে রেলের গার্ডদের হাতে থাকে। আমাদের হারিকেন লণ্ঠনের পাশে ওদের সেই বাতিটা জ্বলে দেখাত।

বুড়ো বামুনদের দাঠাকুর বলা কিংবা লোকবিশেষের নামের সঙ্গে ঠাকুর জোড়া—এসব ছিল তখনকার প্রথা।

মোনা যে সারা গাঁয়ে মোনাঠাকুর হয়ে গিয়েছিল, সেটা খানিকটা ঠাট্টার ছলে। মোনার ছিল একটু রগচটা ভাব। বুদ্ধিটাও ছিল একটু মাটো। একেবারেই রসিকতা বুঝত না। নিশ্চয় আলজিভেরও দোষ ছিল। নইলে কথা বলতে গিয়ে গলা অত ফুলে উঠবে কেন?

ও আরও হাসির পাত্র হয়ে উঠল পৈতে হওয়ার পর।

কলকাতার কালীঘাটে ওর পৈতে হওয়ার গল্প ওর মুখে শুনেছিলাম ছুটিতে গ্রামে এসে।

ততদিনে আমি ভুলে মেরে দিয়েছিলাম কলকাতার স্মৃতি।

মোনাঠাকুরের কথাগুলো ভাসাভাসাভাবে মনে পড়ে। মোনাঠাকুর গদগদ হয়ে বলেছিল : সে কী শহর রে ভাই, ব্যাস রে! এ-বগল দিয়ে ট্রাম চলে যায়, ও-বগল দিয়ে বাস। সে যা দেখলাম রে, ভাই—কওয়া না যায়। পিড়িক করে কল টিপলে চিড়িক করে আলো জ্বলে। আর কল ঘোরালেই জল। রাতগুলো সব দিন হয়ে যায় আর দিন-গুলো যেন আলাদিনের আলো। দোকানে গিয়ে মুখ ফুটে শুধু বলবে। যা চাও তাই পাবে। শহরটাকে উঠিয়ে নিয়ে এসে যদি দেখাতে পারতাম, গাঁয়ের লোকের তবে পেতায় হত। কী যে দেখে এলাম, সে আর কওয়া না যায়। গায়ে-গায়ে পেল্লায় বাড়ি। আশ নেই পাশ নেই। মাটি নেই ঘাস নেই। খালি শানবাঁধানো পাথর। রাস্তায় গিশগিশ করছে লোক। এদিক থেকে এ টানে, বলে এসো। ওদিক থেকে ও টানে, বলে এসো। আমি

বাবা সেয়ানা। শক্ত করে ধরেছি মা-র আঁচল। ওরা সব ফুল শুঁকিয়ে ঝোলায় পুরে ফেলে। ছেলেধরা। এমনিতে বেশ আছে শহরটা। হঠাৎ-হঠাৎ বিগড়ে যায়। মাথায় খুন চড়ে। রাস্তা শুনশান। মোড়ে-মোড়ে লাঠি-সোঁটা আর শরকি-কাটারি। এ বলে, জয় মা কালী। তো ও বলে আল্লা হো আকবর। ধর্মশালায় রাত্তিরে ঠকঠক করে আমরা কেঁপেছি। যেই না রাত ফরসা হওয়া ছ্যাকরা গাড়ির জানলা এঁটে সেখান থেকে দে ছুট। সোজা এসে উঠেছি শেয়ালদার ট্রেনে। ঘুরে-ঘুরে দন্ডবৎ, ভাই—ও শহরে আর যাই!

শুনে আমারও মন খারাপ হয়, বাপু। কী শহর রেখে এসেছিলাম। তার আজ এই হাল?

মোনাঠাকুরের সঙ্গে আমার বেশ ভাবই ছিল বলতে হবে। সারা হপ্তা অত বড়ো দোতলা বাড়িতে মা আর ছেলে দুটো প্রাণীতে ওরা থাকত। ওর বাবা বোধহয় রেলের গার্ড ছিলেন। দেয়ালে ছবি বলতে সব বাড়িতে যেমন হয়। ঠাকুরদেবতাদের বাঁধানো শিবকাশীর কিছু রঙিন প্রিনট। সেইসঙ্গে কিছু গ্রুপফটো আর ওর টেকো বাবার একটা সাদায় কালোয় আঁকা ছবি। নিশ্চয় ফটো থেকে এনলারজ করে তারপর তাতে তুলি বোলানো হয়েছে।

ওদের বাড়িতেই প্রথম দেখি নরকযন্ত্রণার সচিত্র বিবরণ। বড়ো-বড়ো কড়াইতে ফুটন্ত তেলে যমদূতের দল পাপীতাপীদের ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। শাস্তির কত রকম যে নারকীয় ব্যবস্থা। পাপে যেমন লঘুগুরুভেদ আছে, সাজারও তেমনি আছে কমবেশি। ক্যালেনডারের মতো দেয়ালে সেটা টাঙিয়ে রাখা যায়। পাপ করবার আগে মানুষ যাতে তার ফলাফলের কথা দুবার ভাবে।

মওকা পেলেই ওদের ওই ভূতুড়ে বাড়িটাতে বসে আমরা গোলকধাম খেলতাম। মোনাঠাকুর ন্যালাখ্যাপা সেজে থাকলেও কী করে কী করে যেন ছক্কা চেলে ঠিক গোলকধামে উঠে যেত। আমি বেচারা পাতালে পড়ে নাকানিচোবানি খেতাম।

একদিন ওদের আলমারি থেকে টেনে বার করেছিলাম মজার একটা বই। 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন'। ওই ঘুজঘুজে চিমসেপড়া বাড়িটাতে সেই একবারই যা নিজের মনে খিলখিল করে হেসেছিলাম।

পৈতের পর মোনাঠাকুরের রাগের যেন আরও বৃদ্ধি হল। রাস্তায় যারই সঙ্গে চটাচটি হয় তাকেই ও পৈতে উঁচিয়ে শাপ দেয়।

ভেতরে-ভেতরে বামুনপাড়ার ওপর রাগ তো কম নয় পাড়ার লোকের। ওকে দেখলেই ছেলের দল পেছনে লাগে :

ও মোনাঠাকুর,
নারদ! নারদ!
যাও কমুনে?
পাগলা গারদ॥

শোনামাত্র পেছনে ফিরে শুরু হয়ে যায় মোনা-ঠাকুরের তোদের এই হবে সেই হবে বলে সমানে শাপমন্যি।

সেজোমা-র কথা তো এখনও বলি নি। মোনাঠাকুরের মা। ক্রমশ ও হয়ে উঠছে একেবারে উপরোনো সেজোমা।

সেজোমা যেখানে রাঁধতেন, সেটা ও'দের সামনের উঠোন পেরিয়ে একেবারে সদর রাস্তার কাছাকাছি। গেরস্থবাড়িতে কখনই এটা হওয়ার কথা নয়। নাকি ওটা ছিল কখনও ও'দের ঠাকুরঘর?

আগেকার কালে বেগমদের নাকি নিজস্ব একটা করে গোঁসা-ঘর থাকত। সেখানে তাদের মান ভাঙানো হত।

সেজোমা-র ব্যাপারটা ছিল আলাদা। রাঁধতে-রাঁধতে সেজোমা কাঠের আঁচে মেজাজটাকে তাতিয়ে নিতেন। তারপর উনুনে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়েই ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেতেন। ও'দের রান্নাঘরের ঠিক পেছনেই আমাদের বাইরের বাড়ির উঠোন।

সেজোমাকে সেই ফাঁকা জায়গাটাতে এসে দাঁড়াতে দেখলেই আমি আর দাদা নাটক দেখার ভাব নিয়ে জানলায় এসে দাঁড়াতাম। সেজোমা প্রথমে থুক করে মুখের মিশিটুকু ফেলে সোজা গাছকোমর হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে শুরু করতেন ও'র পালাকীর্তন।

ওরে ও ড্যাকরা। ওরে ও আঁটকুড়োর ব্যাটা। ওরে ও আবাগী, হাভাতের মা। মুখপুড়ি ভাতরখাগী। অলপ্পেয়ে অলবড্ডো। বাস, চলল গাড়ি। প্রথমে মেল, মাঝে প্যাসেনজার। তারপর গলা শুকিয়ে এলে মাল-গাড়ির মতন টিকিস টিকিস।

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ধারেকাছেও নেই। কিন্তু একটু কান

পেতে গোটাটা শুনলে বোঝা যাবে কী কে কবে কেন।

ইতিহাস বলে, মানুষের শোকের কান্না থেকে নাকি গান এসেছে। তা যদি হয়, তাহলে এই শাপমন্যি আর গালাগালি থেকে কী এসে থাকতে পারে? ঢোলগোবিন্দ ভেবেছে অনেক। কিন্তু কূলকিনারা পায় নি কোনো। কেচ্ছা বা কিস্‌সা কি?

সেজোমা-র সময়জ্ঞান ভারি নিখুঁত। হাতে ঘড়ি না থাকলেও ঠিক জানে ভাত হয়ে গিয়ে কখন ঠিক ফেন গালতে যেতে হবে। হাজার শাপমন্যি করলেও ঠিকেয় কখনো ভুল হয় না।

কিছুক্ষণের জন্যে পাড়া এবার ঠাণ্ডা। সেজোমা-দাঁতে আরেকবার মিশি দিয়ে নেবেন। তরিতরকারি-গুলো কেটে-কুটে নিয়ে কড়াই চাপাবেন। তারপর ঘটির জলে হাত ধুয়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের পেছনে গিয়ে রণরঙ্গিনী বেশে দাঁড়াবেন।

শুরু হবে সেজোমার শাপমন্যির দ্বিতীয় পর্ব।

ভাত তো নয়। উনুনে এখন তরকারি। কাজেই সময়টা কম লাগবে। মুখ দিয়ে কথা বার হবে তোড়ে। কোমর বেঁকে গিয়ে ঘাড়টা একবার করে নামবে আর উঠবে।

পাড়ার লোকে সেজোমাকে বলে খান্ডারনী বুড়ি। হতে পারে। কিন্তু সেজোমা তো দাদাকে আমাকে বেশ ভালোবাসে। ডেকে-ডেকে এটা-সেটা খাওয়ায়। পায়ে পা বাধিয়ে যে ঝগড়া করে তাও নয়। কিন্তু তাই বলে তুমি সেজোমার ল্যাজে পা দেবে আর সেজোমা আদর করে তোমার গালে চুমো খাবে, তেমন বাপের বেটি সেজোমা নয়। কারো সঙ্গে কথাকাটাকাটিতে সেজোমা নেই। সেজোমার হাত খালি হলে গোঁসার জায়গায় দাঁড়িয়ে সেজোমা তার ধড়ধড়ি নেড়ে দেবে। একদিনে না হয় তো দশদিন ধরে চলবে সেজোমার শাপমন্যি।

বামুনপাড়ার শেষ বাড়িটা আশু দাদামশাইদের। কাসটমস থেকে কাঁচাপাকা চুলে সবে রিটায়ার করে দেশে এসে আছেন। নির্বিরোধ শান্তিপ্রিয় ঘরকুনো মানুষ। বাঙাল ঠাকুমা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দুপক্ষের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। ফকিরকাকা বড়ো, মেজো কাবুকাকা। এ পক্ষের সব এন্ডাবাচ্ছা।

ঠাকুমা যতই ঢাকবার চেষ্টা করুন, কথার টানে ঠিক ধরা পড়ে যান। নাতি সম্পর্ক তো। আমরা তাই অনা-য়াসে ঠাকুমার পেছনে লাগতে পারি।

হাজুকাকা-খটিকাকারা হলেন ওবাড়ির আরেক শরিক। বাবার ছেলেবেলার বন্ধু হাজুকাকা। কলকাতায় হাওয়া-আপিসে কাজ করেন। পরিবারের সবাই দেশের বাড়িতেই থাকে।

গাঁয়ের ভদ্রলোকদের তখন নেই-নেই করেও দেশে বেশ খানিকটা জায়গাজমি ছিল। বাজার থেকে ধানচাল কেনার দরকার হত না। চুলকাটা, মালবওয়া, দুধের যোগান, মায় রোজকার মাছ অবধি প্রজাদের ঘাড় ভেঙে উশুল হত। বাবুর শহরে মেসে থাকতে আর সপ্তাহান্তে রেলভাড়াটুকুই যা খরচ। গাঁয়ে থেকে ছেলেদের লেখা-পড়া যা হওয়ার হত। ও নিয়ে বড়ো একটা কেউ মাথা ঘামাত না। মেয়েদের বেলায় ভাবনা ছিল শুধু বিয়ের।

লোকনাথপুরে নামকরা লোক বলতে ছিলেন দুজন। ওপাড়ার ঘোষবাড়ির এক বুড়ো চাকুরে। বাবা তাঁকে মিতে বলে ডাকতেন। তিনি গাঁয়ে আসতেন কালেভদ্রে। এলে বাবাই খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে দেখা করতেন।

ওপাড়া-এপাড়ার মধ্যে একটা চাপা মনকষাকষি ছিল। ওপাড়ায় ছিল ফটবলের মাঠ। সেই সুবাদে এপাড়ার জোয়ান ছেলেরাই শুধু ওপাড়ায় যেত। তা ছাড়া এপাড়ার বামুনদের যে একটা হামবড়া ভাব ছিল, সেটা ওপাড়ার অনুচ্চবর্ণের ভদ্রলোকদের একেবারেই বরদাস্ত হত না।

শিক্ষাদীক্ষা চাকরিবাকরিতে সুযোগ সুবিধে পেয়ে অবস্থাপন্ন তপশীলীদের ঘরের ছেলেরা তখন চড়চড় করে ওপরে উঠছিল। তাদের মাটির বাড়ির ভিটেয় উঠছিল পাকা দালান। পড়ন্ত বামুনদের কী চোখটাটানি।

আমাদেরই গাঁয়ের খটিকাকা তখন বাঙলার এক বিখ্যাত লোক। 'পল্লীবাথা'র কবি। উপাসনা-পত্রিকার সম্পাদক। গোলপুকুরে ছাপাখানা। স্বরাজ্য পার্টির বড়ো-বড়ো নেতাদের সঙ্গে তাঁর মাখামাখি। দ্যাখো নি খটিকাকাকে? সর্বাঙ্গে খদ্দর।

খটিকাকা বললে আর কটা লোক চিনবে! বলতে হবে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তখন সবাই অবাক হয়ে বলবে—ও, উনি বুঝি তোমার কাকা হন? হ্যাঁ, আমরা এক-গাঁয়ের লোক। আমাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টি।

ঢোলগোবিন্দরা সোজা লোক নাকি?

কেন, খটিকাকার কবিতা পড় নি? 'নলগাড়ি নয়, চিত্রা নদী সে, এদিকে দোহার বিল। দেয়াড়ের জমি লোকনাথপুরে, সেথা চাষ হত নীল।' বেথুয়াগাড়ি, দুধ-পাতিলা, কদমতলার হাটও খটিকাকার হাত ধরে বাঁচার একটা রাস্তা করে নিয়েছে। দেখেছ, কলমের কী জোর?

সামনের উত্তরমুখো রাস্তাটা খানিক এগিয়ে হঠাৎ ডাইনে মোচড় দিয়ে চলে গেছে দোহার বিল আর দেয়াড়ের দিকে।

সেইখানে ঠিক মোড়ের মাথায় কামারবাড়ি। সকাল সন্ধে সারা গাঁয়ের সবচেয়ে বড়ো আড্ডাখানা।

আরেকঘর কামারের বাস আরেকটু পশ্চিমে। আমা-দের বাড়ির বরাবর। ঘটা কামার। বয়সে অর্বাচীন। সন্ধে হলেই ঝাঁপ বন্ধ করে সে সিঙ্গল রীডের হার-মোনিয়াম বার করে সুর ভাঁজে।

ঘটা কামার লেখাপড়া না জানুক, তার ছিল গান বাঁধার ক্ষমতা। বছরে একবার গাঁয়ে কী একটা নাকি পরব হত। সেখানে সারা বছর গাঁয়ে কী ঘটেছে না ঘটেছে, গানের ভেতর থাকত তার সাল-তামামি। ঢোলগোবিন্দ কখনও শোনে নি। কিন্তু তাতে নাকি থাকত বহু বাড়ির হরেক রকমের কেচ্ছা। আর বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি সব কথা। ওটা ছিল দেশাচার। তাই ঘটা কামারের ছিল সাতখুন মাপ। কিন্তু বছরে ওই একদিনই। হলে হবে কী, সেসব কেচ্ছা অনেকদিন অবধি লোকের মুখে-মুখে ফিরত। আর ঠোঁটকাটারা তার সুযোগ নিত।

রথের কাছাকাছি অম্বুবাচীতে হত মেটেরির মেলা। কোনো এক পরীরের দরগায়।

দুমাস আগে থেকেই কামারবাড়িতে, কুমোরপাড়ায় আর ছুতোরবাড়িতে পড়ত সাজো-সাজো রব। কাজ হত রাত জেগে।

এই সময়টা কামারদা দম ফেলার সময় পেত না। আড্ডাও তেমন জমত না। আড্ডা মানে তো সব সময় ভদ্দরলোকদের সম্বন্ধে কিটিয়ে-কিটিয়ে কথা বলা আর পেছনে কাঠি দেওয়া।

ঢোলগোবিন্দর মোটেও তা শুনতে ভালো লাগে না। ওরও যে গায়ে বেঁধে।

মেলার আগে এই সময়টা মুখে সবার ছিপি আটা থাকে। আর ঢোলগোবিন্দ যখন হাতুড়ি তুলে নিয়ে সাঁড়াশিতে ধরা গনগনে লোহাটাকে পেটায় কিংবা হাপর টেনে-টেনে লোহাগুলোকে লাল টকটকে করে তোলে, কিভাবে যেন ওদের সঙ্গে নিজেকে সে মিলিয়ে দিতে পারে। সন্ধের পর লোহাচুরগুলো ও 'যখন আগুনে ফেলে ফুলঝুরি বানায় ওর ছেলেমানুষি দেখে অবনীদা হেসে ফেলে।

অবনীদার আবার একটা চোখ। অন্য চোখটা গরম লোহার কুচি পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

অবনীদার বাবা ছেলেবেলায় আমার বাবার সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছে। খেলাধুলোও করেছে একসঙ্গে। কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকে না। 'বন্ধু' বলে ডাকে।

লোকনাথপুরে সাদাচুলের অনেকেই বাবাকে 'ক্ষিতু' বলে ডাকত। তার মানে, বাবারও একটা ছেলেবেলা ছিল।

মুখে 'ক্ষিতু' বললেও সম্পর্কগুলো কিন্তু ঠিক আগের মতো সহজ থাকে নি। অবস্থার তারতম্যই শুধু নয়, শিক্ষাদীক্ষা আর জাতের বালাইটাও ক্রমেই মাঝখানে উঁচু হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ঢোলগোবিন্দ তো বোকা নয়। দু-পক্ষেরই কষ্ট ওর চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ত।

তারপর নিজের কথা ভাবত। বড়ো হয়ে জয়দেব আর কাশীরামের সঙ্গে তার সম্পর্কেও কি এমনি টান পড়বে?

ছুটিতে দেশে গেলেই ব্রহ্মডাঙা থেকে রোজ কাঁসার একটা ঘটে করে আমার জন্যে দুধ নিয়ে আসত এক বিধবা। আমাকে সে বলত ধর্মবাপ। ঠিক এপাড়া ওপাড়া তো নয়। অনেকখানি পথ তাকে হেঁটে আসতে হত। মেয়েটি ছিল মুখচোরা লাজুক। তার নামধাম, কেন কিভাবে আমি তার ধর্মবাপ হয়েছিলাম—সেসব কিছুই আমার মনে নেই। কোনোরকম স্বপ্ন দেখার ব্যাপার ছিল কি?

খালি ঘট নিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় তার চোখে-মুখে উপচে পড়ত একটা স্বর্গীয় আনন্দ। অথচ এমন নয় যে সে আমাদের ঠাকুরদার প্রজা। এতটা রাস্তা ঠেঙিয়ে আমাকে দুধ খাওয়াতে আসার এমনিতে কোনো দায়ই তার থাকার কথা নয়। যতক্ষণ সে থাকত, আমার কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। তার ধর্মবাপ লজ্জা-

লজ্জা মুখ করে তার গা ঘেঁষে দাঁড়াত। অথচ গাঁয়ে তার কে আছে কী বৃত্তান্ত—একবার জিগ্যেস করবে তো? কোনোদিন তা করে নি।

আর ধাড়ি হয়েও ঢোলগোবিন্দ যার কোলে চড়ে বেড়াত, তাকে আদর দিয়ে বাঁদর করেছিল যে—সেই শরৎপিসি? এক ভাইপো ছাড়া তিনকুলে যার কেউ ছিল না?

গোয়ালার ঘরে জন্মালেও আপন পিসির চেয়েও আমরা বেশি ভালোবাসতাম শরৎপিসিকে। এক ভাই ছাড়া তার তিনকুলে আর কেউ ছিল না। ভাইয়ের সংসারটা সেই মাথায় করে রেখেছিল।

মা যখনই দেশের বাড়িতে আসতেন, শরৎপিসি হত মা-র হাতনড়ুকুত। যাবতীয় কাজ হাসিমুখে করবার ক্ষমতা ছিল ওই এক শরৎপিসির। আমার অন্য পিসিরা এলে তো সব ভার মা-র ঘাড়ে চাপিয়ে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকত।

শরৎপিসির গায়ের রঙ ছিল গৌরবর্ণ। চুল ফেলে দিয়ে এসেছিল নবদ্বীপে। তাতেও মুখের লক্ষ্মীশ্রীটুকু যায় নি। সাদা ঝকঝকে দাঁত। পানতামাকের কোনো নেশা ছিল না। হাসিতে মুখ ভরা থাকলেও ফাঁকাশে ঠোঁটদুটোতে ছুঁয়ে থাকত জীবনে অনেক কিছু না পাওয়ার শূন্যতা।

কোলে ওঠার সুবাদে শরৎপিসির গায়ের গন্ধগুলো ঢোলগোবিন্দর আজও মনে আছে। শরৎপিসি যখন আসত তখন তার গায়ে লেগে থাকত মাখনতোলা দুধের সুন্দর একটা টক-টক ভাব। আর বেলায় যখন কাজ সেরে বাড়ি যেত, তখন গায়ে মাখিয়ে নিত পেঁয়াজরসুনে মেশা একটা বিচ্ছিরি আঁশটে গন্ধ।

গোরু চরাতে যেত ঘোষেদের বাড়ির যে ছেলেটা, তার গানের গলার কথা মনে আছে কি তোমার, ঢোলগোবিন্দ? সন্ধে হওয়ার মুখে পাঁচন হাতে গোরুর পাল নিয়ে যখন সে গান গাইতে-গাইতে ফিরত?

ঢোলগোবিন্দর কানে যায় না সে কথা। চোখে এখন তার গোরুর খুরে-খুরে ওড়া গোধূলি।

আর এই ধূলোগুলো থিতিয়ে গেলেই, সামনের বাঁধানো ইঁদারার পেছনে জিওলগাছের গায়ে পশ্চিমের রোদ পড়ে, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখে সে শিউরে উঠবে।

ছায়া যত পূর্বগামী হবে, ততই দুষ্টিটা তার আরও গুটিয়ে আসবে। বাঁধানো বারান্দাটার কোলে।

দিনে যেখান দিয়ে দুবেলা গড়িয়ে পড়ে আঁচানোর জল, হুঁকোর জল, যেখানে সূর্যের তেতাও আউড়ে জল-চৌকিতে বসা ঠাকুরদা ঘটি-ঘটি জল গামাথায় উপুড় করে দিয়ে ভিজে গামছা নিংড়ে নেন, আর সন্ধের পর বাড়ির বেটাছেলেরা যেখানে অন্ধকারে সাপের ভয়ে মাঠে না নেমে ওপর থেকেই টুকটাক ছোটো কাজ সেরে নেয় —সেখানে এঁটো জলে আর অ্যামোনিয়ার সারে দিদির হাতের লাগানো গোলাপগাছে থরে-থরে কত ফুল ফুটেছে, দ্যাখোসে।

আর দিদির জন্যে তখন কী যে মন কেমন করে, বলার নয়।

ঢোলগোবিন্দ সেজোকাকার সঙ্গে দাদার হাত ধরে কাল গিয়েছিল ডুগডুগির হাটে। পাকাপাকি দোকানঘর আছে দুটো চারটে। এক তো বেনেমশলার দোকান। টুকিটাকি মনিহারি জিনিসের এক পাইকার। পা-কল নিয়ে টিমটিম করছে এক দরজি।

গামছা কাপড় মেলে হাটে। ময়রা বসে বাতাসা-কদমার ডালা সাজিয়ে। হিম পড়লে সবজি-আনাজের ঢল নামে। নাপিতরা চুল ছাঁটে, দাড়ি কামায় এক কোণে বসে।

রসগোল্লা-রসমুন্ডির দোকানও ছিল একটা নিশ্চয়। নইলে অতটা পথ ঠেঙিয়ে এমনি-এমনি কি আর ডুগ-ডুগির হাটে যেতে চায় ঢোলগোবিন্দ?

আমাদের গ্রাম থেকে ডুগডুগির হাট যতটা, আর মাত্র ততটা গেলেই দিদির শ্বশুরবাড়ি। জয়রামপুর।

সঙ্গে-সঙ্গে দাদা ঢোলগোবিন্দর মাথায় গাঁট্টা মারে। এই, বারণ করেছে না ও-নাম বলতে? বলবি, বড়গাঁ।

হ্যাঁ, বড়গাঁ। জয়রামপুর বললে নাকি হাঁড়ি ফাটে। শুনে মন খারাপ হয় ঢোলগোবিন্দর। হাজার হোক, ওটা তো দিদি-জামাইবাবুদের গ্রাম।

ডুগডুগির হাটে পৌঁছেই ঢোলগোবিন্দর মনে হয়েছিল—ইশ্, আরেকটু গেলেই তো দিদির শ্বশুরবাড়ি। একবার চট করে গিয়ে দেখা করে এলেই হয়। দিদি নিশ্চয় শুনেছে যে, আমরা এসেছি। দিদিও তো একবার এসে আমাদের দেখে যেতে পারে। মাকে দেখতে ওর

ইচ্ছে হয় না? ওর অত সাধের গোলাপগাছ? আঃ, কী ফুল ফুটেছে রে, দিদি!

দাদা আবার গাট্টা মারে। ভেঙিয়ে বলে—দিদি দিদি দিদি! জানিস নে, দিদি এখন পর হয়ে গেছে?

হুট বললেই কি আর এখন দিদির বাড়িতে যাওয়া যায়? মনে রাখিস ওটা আমাদের কুটুমবাড়ি। দিন ঠিক করে আগে থেকে জানিয়ে যেতে হবে। খালি হাতে গেলে তো চলবে না। ভালোমন্দ কিছু না নিয়ে গেলে দিদির আবার মাথা হেঁট হবে। উঠতে-বসতে শ্বাশুড়ির মুখ-নাড়া খেতে হবে।

ঢোলগোবিন্দর উৎসাহে আস্তে-আস্তে জল পড়ে। অনেক কথা তার মনে পড়ে যায়।

দিদির বিয়ের পর থেকে বাবার মনে আর শান্তি নেই। কিছুদিন পর-পরই দিদির শ্বাশুড়ির কাছ থেকে আসে শেল-বেঁধানো একটা করে চিঠি। বিয়েতে অমুকটা দেওয়া হয় নি, তমুকটা দেওয়া হয় নি। জামাইষষ্ঠীতে এবার এটা দিতে হবে, সেটা দিতে হবে।

সেই সঙ্গে আসে দিদির করুণ চিঠি। মা যেন বাবাকে বলে জামাইয়ের জন্যে একটা গরদের পানজাবি আর একসেট সোনার বোতাম অবিশ্যি-অবিশ্যি পাঠিয়ে দেয়। দিদির আর সহ্য হচ্ছে না উঠতে-বসতে শ্বাশুড়ির বাক্যযন্ত্রণা।

মা অতটা উতলা হন না, যতটা বাবা হন। বাবা ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, খুকী যদি সহ্য করতে না পেরে গলায় দড়ি দেয়, কি বাড়ির পুকুরে ডুবে মরে?

তুমিও যেমন! বলে মা গম্ভীর হয়ে উঠে পড়েন।

দিদির শ্বশুরবাড়ি যেমনই হোক, জামাইবাবুটি ঢোলগোবিন্দর খুব পছন্দ। ময়ূরছাড়া কার্তিকের মতো চেহারা। টকটকে রঙ। চুমরানো সরু গোঁফ। এসরাজ বাজান। শিকারে যান। খুব মাইডিয়ার জামাইবাবু।

জমিদারের ছেলে তো। তাই করেন না কিছু। এক-মাত্র দোষ, বিধবা মা-র ভারি বাধ্য।

আর হবি তো হ, জামাইবাবুর ছোটো ভাই মুরারিদার সঙ্গে ডুগডুগির হাটেই দেখা হয়ে গেল।

মুরারিদা ভারি আত্মীয়স্য মানুষ। বললেন, চলো চলো, দিদির সঙ্গে দেখা করে আসবে।

সেজোকাকার পক্ষে সেটা কাটিয়ে দেওয়া কঠিন হয় নি। গেলে বাড়ির লোকে সতিই ভাবত। তা ছাড়া ঠাকুরদা পিঠের ছাল তুলে দিতেন না! দেশের বাড়িতে তো ঠাকুরদাই কর্তা।

ফেরার একটা টানও ছিল। সেজোকাকা বড়ো দেখে একটা উবি কিনেছে। মা রাঁধবে। আঃ, খেতে যা হবে ভাবা যায় না।

ফিরে গিয়ে একটা নৃশংস ব্যাপার হবে উবিটাকে নিয়ে। কাটা হবে না। খড়নুড়ো জেলে আগে ওটাকে পুড়িয়ে মারা হবে। কিন্তু ঢোলগোবিন্দ তার ধারেকাছে থাকবে না। ওর আবার খুব নরম মন। কারো কষ্ট দেখলে ও সহ্য করতে পারে না। তা সে মানুষই হোক আর জন্তুজানোয়ারই হোক।

অথচ পাতে মাংস পড়ুক, চেটেপুটে খাবে। তখন বুঝি মনে পড়ে না উবিটাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল? যতক্ষণ নড়ছিল চড়ছিল, ততক্ষণ বুকের মধ্যে কী হাঁড়পাঁড়। জীবে কী দয়া। রান্না হয়ে যাবার পর তখন নোলা সপসপ করবে। জিভের কাছে আর তখন লেশমাত্র দয়ামায়া নেই। ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে এইখানেই তফাত। দাদার মধ্যে পেটে ক্ষিধে মুখে লাজের কোনো ব্যাপার নেই। ঢোলগোবিন্দকে যতই ভালো-বাসুক, ওর ন্যাকামি-ভণ্ডামিগুলো দেখলে দাদা পেছন থেকে এসে ক্যাঁত করে এক লাথি মারে।

দাদার একটু বাড়াবাড়ি। না, শুধু উবি বলে নয়। দেশের বাড়িতে এলে ঢোলগোবিন্দ মুখে সব-কিছুর একটা নতুন তার পায়।

ডুগডুগির হাটে কেনা শাকসব্জির স্বাদই আলাদা। তা ছাড়া মাটির হাঁড়িতে ভাত আর কাঠের জ্বালের ঢিমে আঁচে রান্না।

বিলের জল মরে আসছে। কুঁজো হয়ে মাথা ডোবাতে হয়। আর নদী তো সেই মাথাভাঙা। কুড়ুলগাছির রাস্তায়। অনেকটা দূর।

কাজেই গাঁয়ে মাছের খুব আকাল। চুনোচানা মাছ মালো মেয়েরা খালবিল ছেঁচে মাঝেমধ্যে বাড়িতে দিয়ে যায়।

গ্রামের কেউ কখনও সখনও পাঁঠাখাসি মেরে ভাগা হিসেবে বিলিবাটা করে।

মুসলমান পাড়ায় দেশি মুরগির ছানাগুলো চরে বেড়াত। হিন্দুরা তার সামনে দিয়ে নাক সিঁটকে হেঁটে

যেত। হিন্দুরা বলত রামপাখি। তার মাংস বা ডিম তাদের হেঁসেলে ঢোকা বারণ।

ভোরবেলা জিরেন কাটের রসের কথা মনে আছে তোমার, ঢোলগোবিন্দ? নলগাড়ির কাছে মাঠের মধ্যে সেই অষ্টাবক্র মুনির মতো সব তাড়াব্যাঁকা কাঠখোট্টা খেজুরগাছ। সেইখানে ছিল জয়নালের বান। মুখের ওপর বড়ো-বড়ো কড়াই চাপানো উনুনের আগুনে সন্ধেবেলায় হিম-পড়া অন্ধকার চমকে চমকে উঠত। গায়ে দোলাই টেনে আমরা উবু হয়ে বসতাম হাতে একটা করে পাতা নিয়ে। জয়নাল লম্বা একটা হাতা দিয়ে তার ওপর আলতো করে ছেড়ে দিত ফুটন্ত নলেন গুড়। পাতার পরিধিটুকুর মধ্যে জিভে জল গড়িয়ে টলমল টলমল করছে কাঠের বকেচেরা অনির্বচনীয় স্বাদেগন্ধে ভরা গরম আগুনের মতো সেই রস। মুখ দিতে পারছে না পুড়ে যাওয়ার ভয়ে। বেশি ফুঁ দেওয়াও যাবে না, পাছে জুড়িয়ে জল হয়।

ঢোলগোবিন্দ তার জীবনটাকে আজও যেন জয়নালের সেই বানে এক উভয়সংকটের মধ্যে পাতা হাতে বসিয়ে রেখেছে।

[ক্রমশ

রাজনীতিক ও রাজনীতি

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

কেউ ডাকতারি করেন, কেউ ওকালতি করেন, কেউ মাস্টারি করেন, কেউ রাজনীতি করেন : এইভাবে রাজনীতিকে যদি আর-পাঁচটা বৃত্তি বা পেশার মতো করে দেখা যেত তা হলে অন্তত এই একটা সুবিধা হত যে, সেই পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সমাজ কী দাবি করতে পারে, আর তাঁরাই বা সমাজের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করতে পারেন, তা নিয়ে ভুলবোঝাবুঝির অবকাশ কম থাকত। যেমন ধরুন, একজন ডাকতার। তিনি নিঃসন্দেহে সমাজের সেবা করেন। চাকরিই করুন, আর স্বাধীনভাবে প্র্যাকটিসই করুন, আর্তের সেবার যে ব্রত তিনি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছেন, তাকে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-অসুবিধার ওপরে স্থান দিতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। (সে প্রতিশ্রুতি সব ডাকতার সাধ্যমতো পালন করেন কিনা, সে কথা আলাদা।) তেমনি, একজন আইনজীবীর বিধিবদ্ধ কর্তব্য এবং দায়িত্ব ন্যায়-বিচারের কাজে আদালতের সহায়তা করা। অর্থাৎ শিক্ষা দিয়ে, অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দিয়ে সমাজ যাঁকে যে বৃত্তির উপযুক্ত করে তুলেছে সেই বৃত্তির সাহায্যে তিনি সমাজের বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধন করবেন, সমাজের সেবা করবেন। এ তাঁর অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

কিন্তু তাই বলে সে কাজ তিনি করবেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে, নিজের যোগ্যতা এবং দায়িত্ব অনুযায়ী পারিশ্রমিক, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক মানমর্যাদা প্রত্যাশা করবেন না—এমন অন্যায় এবং অবাস্তবোচিত দাবি সমাজ করে না। করে না যে—তার কারণ, প্রথমত ডাকতার বাঁচলে তবেই রোগী বাঁচবে, উকিল বাঁচলে তবে আসামী বাঁচবে ; দ্বিতীয়ত, ডাকতার কিংবা উকিল, এমনকি শিক্ষকও, পাঁচজনকে ডেকে বলেন না, জনগণের সেবা করাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, সেই সেবার সুযোগটুকু পেলেই আমি ধন্য। সবাই জানে, বিভিন্ন পেশায় যাঁরা নিযুক্ত তাঁদের দক্ষতা, কুশলতা এবং যশ অনুযায়ী প্রাপ্য দক্ষিণা দিতে হয়।

পেশা নয়, বৃত্তি নয়

একজন রাজনীতিকের কাছে সমাজের প্রত্যাশা অন্যরকম। রাজনীতি পেশা নয়, বৃত্তি নয়। তার জন্যে কোনো শিক্ষাক্রম নেই, কোনো পরীক্ষা নেই। গ্রামপঞ্চায়েতের

কিংবা ভারতীয় সংসদের সদস্য প্রায় যে-কোনো বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি হতে পারেন। স্বিতীয়ত সাধারণভাবে বলতে গেলে, রাজনীতিক হিসেবে রাজনীতিকের কিছু প্রাপ্য নেই; সমাজের কাছে তাঁর কোনো দাবি নেই। এমনকি তিনি যখন উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত হন, তখনও কোনো-ক্রমেই বলা চলে না, তাঁর বেতন তাঁর দায়িত্ব এবং পদ-মর্যাদার উপযুক্ত। অবশ্য আমরা সবাই জানি কেন্দ্রের কিংবা রাজ্যের একজন মন্ত্রীর জন্যে বেতন ছাড়াও অর্থাগমের এবং অর্থাগম ছাড়াও নানাবিধ নিখরচার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান থাকে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে যেটা লক্ষণীয় তা হল, সোজা হিসেবে শ্রমের, অথবা সেবার, বিনিময়ে প্রাপ্য যে পারিশ্রমিকটি, একজন রাজ-নীতিকের বেলায় সেটা যেন ঠিক ধর্তব্যের মধ্যেই নয় বলে মনে করা হয়।

কেননা মন্ত্রী চাকুরে নন, কোনো পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি নন, জনসেবায় নিযুক্ত জনপ্রতিনিধি। তিনি প্রশাসক নন, শাসক; গণতন্ত্রের রাজমুকুট তাঁর শিরে।

কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষ। না, 'কিন্তু' নয়। সাধারণ মানুষ বলেই গণতন্ত্রে তিনি উচ্চতম মর্যাদার অধিকারী, সেইজন্যেই দেশের শাসনভার তাঁর হাতে ন্যস্ত। ব্রিটেনে লর্ড ইত্যাদি উপাধিধারী কোনো ব্যক্তি মন্ত্রী হতে পারেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী? কদাচ নয়।

রাজনীতিক যখন জনপ্রতিনিধি, এবং সেই অধি-কারে জনগণের শাসক, কিংবা ঠিক শাসক না হলেও শাসনবিধিনির্ধারক, কিংবা, ঠিক তাও যদি না হন, রাজনৈতিক নেতা, অথবা কর্মী হিসেবে কোনো-না-কোনোভাবে জনমতের সংগঠক এবং প্রতিফলক, তখন তিনি 'কাজের বিনিময়ে বেতন'—এই নিয়মের ঊর্ধ্বে অবস্থিত। সমাজ তাঁকে অবশ্যই পুরস্কৃত করবে, কিন্তু সে অন্যভাবে—আনুগত্যের দ্বারা, সম্মানের দ্বারা।

এইটাই হল, যাকে বলে 'আইডিয়া'; তত্ত্বের কথা বলতে গেলে, একজন রাজনীতিকের সম্বন্ধে এই আমা-দের ধারণা। গণতান্ত্রিক দেশে রাজনীতিকের এই হল আদর্শ। শোনামাত্র মনে হতে পারে, এ নিছক তত্ত্ব, বাস্তবের ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে, অন্তরীক্ষে অবস্থিত। রক্তমাংসের রাজনীতিক অন্য জাতের মানুষ, আমাদেরই মতো, কিংবা আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট, অসাধু, ক্ষমতালোভী, সুবিধাবাদী, অর্থগৃধ্নু। ভালো লোক তাঁদের মধ্যে দু-চার জন থাকলেও সাধারণভাবে রাজ-নীতিকের এই নাকি বাস্তব চরিত্র। কলকাতার একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বোমবাইয়ের অপরাধজগতের এক নামকরা পাণ্ডার একটি বাণী খুব ফলাও করে ছেপেছিল—রাজনীতিকেরা 'সব চোর হ্যায়'। গত কয়েক বছরের অতিশয় জনপ্রিয় কয়েকটি হিন্দি ফিল্মেও সাধারণ গাঁটকাটা, বাটপার, খুনে ইত্যাদির চেয়ে নেতৃ-স্থানীয় রাজনীতিক, মন্ত্রী প্রভৃতির চরিত্র ঘোরতর কৃষ্ণ-বর্ণে অঙ্কিত দেখা গেছে। অস্বীকার করা বৃথা, রাজনীতিকদের নিন্দায় এখন কান পাতা ভার।

নিন্দা উচ্চরব

তবু মনে রাখতে হবে, প্রত্যাশা বড়ো উচ্চ ছিল বলেই নিন্দা এত উচ্চরব। যদি লোকে ধরে নিত, আর-পাঁচটা পেশা এবং বৃত্তিতে যাঁরা নিযুক্ত, রাজনীতিকেরাও তাঁদের মতো প্রদত্ত পরিষেবার বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ-মূল্য আদায় করবেন, নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্যটি সমাধা করবেন বটে, কিন্তু বাকি সময়টায় নিজের জীবন নিজের মতো করে যাপন করবেন, নিজেকে বিকিয়ে দেবেন না 'জনগণের সেবায়', তা হলে বাস্তবটা এত মসীকৃষ্ণ মনে হত কিনা সন্দেহ।

সবাই চোর নন। রাজনীতিক, বিশেষ করে তিনি যদি শাসনক্ষমতার অধিকারী হন, তাঁর বিরুদ্ধে অপ-বাদ সহজেই রটতে পারে। এই প্রসঙ্গে কারো কারো হয়তো মনে পড়বে, এই রাজ্যেরই একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে গুজব রটেছিল, কলকাতার বিখ্যাত স্টিফেন হাউস নাকি তিনি কিনে নিয়েছেন। পরে, যখন তিনি সাধারণ নাগরিকে পরিণত হলেন, দেখা গেল, আর যত কৃতিত্বই তিনি দেখিয়ে থাকুন, স্টিফেন হাউস কিনবার সংগতি তিনি জোটোতে পারেন নি। এমন কি তাঁর নিজের বাড়ি বলতেই কিছু নেই।

(অথচ তিনি অকুতদার, সাংসারিক দায়দায়িত্ব কিছু ছিল না, সরল তাঁর জীবনযাত্রা, রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কোনো পেশায় অথবা বৃত্তিতে তিনি নিযুক্ত থাকলে, অধিকতর আর্থিক সংগতির অধিকারী অবশ্যই হতে পারতেন। হন নি, এবং সেইটাই আমরা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছি। এ থেকেই বোঝা যায়,

সফল এবং কৃতী রাজনীতিকের জন্যে কী মেটিরিয়াল রিওয়ার্ড সমাজে অনুমোদিত।)

তবু, এ কথা ঠিক, 'রাজনীতি' কথাটাই কোনো-কোনো প্রসঙ্গে নিন্দের; মতলববাজির, সংকীর্ণ দলা-দলির প্রায় সমার্থক। রাজনীতি মানেই নোঙরামি, এ ধারণা অতি ব্যাপক। রাজনীতি যেখানে ঢোকে সেখানেই কলুষ ছড়ায়। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সমাজসেবায় রাজ-নীতি ঢোকা মানেই শনির প্রবেশ। এই হল সাধারণের ধারণা।

অতএব সেই রাজনীতি নিয়েই যাঁদের কারবার, তাঁদের কাছে কী আশা করা উচিত? আশা করা উচিত ছিল—অসাধুতা, স্বার্থান্বেষণ, অনৈতিকতা। অথচ, সমস্ত নিন্দাবাদ, কুৎসা, অবিশ্বাসের তলায় যে সত্যটি লুকিয়ে আছে, তা হল—আমরা রাজনীতিকের কাছে চিরকাল প্রত্যাশা করে এসেছি, আজও করি পরার্থপরতা, আদর্শনিষ্ঠা, অসাধারণ সামাজিক দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব-দানের ক্ষমতা, অর্থাৎ সাহস, উদ্যম, বিচক্ষণতা এবং নিজের গুণে দিয়ে, চিত্তশক্তি দিয়ে অপরকে অনুপ্রাণিত করবার ক্ষমতা। আমরা দেখেছি নেতৃত্ব কাকে বলে, অনু-প্রাণনা কাকে বলে। স্বাধীনতার আগে তো দেখেইছি, স্বাধীন হয়েও দেখেছি। এখনও আবার চমকে-চমকে বারে-বারে চাইছি—সেই প্রায় অলৌকসম্ভব নেতৃত্ব বুঝি আবার এল।

তার মানে, সত্যিকারের বড়ো মাপের রাজনৈতিক নেতাকে আমরা রাজনীতির ঊর্ধ্বে স্থাপন করে এসেছি। তিনি দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, গুরু, কিংবা তিনি যাঁর যোধ্য, সেনাপতি, তাঁর আস্ফালিত তরবারি লক্ষ স্বাধীনতা-সৈনিকের ধমনীতে তুফান তোলে, তাঁর অনুচ্চ শান্ত কণ্ঠস্বর রক্তলোলুপ হিংস্রতাকে শান্ত করে দেয়।

আমাদের চোখে এখনও রাজনীতির এই হল সত্যি-কারের রূপ, যে রূপে রাজনীতি নিজেকে ছাড়িয়ে যায়। চারপাশে যা দেখছি তুলনায় তা, মনে হয়, নিছক রাজ-নীতি, যার মধ্যে সাধুতার লেশমাত্র নেই, যা আপাদ-মস্তক কপটতা, ছলনা, সাদা কথায় লোকঠকানোর কার-বার। আগেই বলেছি, এও এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম। আমাদের এই পথঘাটের মাঠময়দানের রাজনীতিও অবি-মিশ্র মন্দ নয়। এর মধ্যেও অনেক সৎ উদ্দেশ্য, অনেক সৎ ইচ্ছা, মানুষের ভালো করবার অনেক সত্যিকারের আগ্রহ কাজ করছে। তবু সন্দেহের পাহাড় উঁচু হয়ে ওঠে, তবু অবিশ্বাসের আবহাওয়া ভারি হয়ে ওঠে।

কারণ কী?

তার একটা কারণ আমরা অনুমান করতে পারি। যেখানেই দেখা যায় কথা আর কাজের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি, সেখানেই অসাধুতা, অন্তত একধরনের অসত্যাচরণ মানসিক অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের সহজাত সত্যনিষ্ঠার মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার যত রকম উপায় আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল বাক্ এবং অর্থের বিচ্ছেদসাধন। রাজনীতি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যেমন এর উদাহরণ দেখি পঞ্জিকায় তাবিজ-কবচের এবং জ্যোতিষ-সম্রাটদের অলৌকিক ক্ষমতার বিজ্ঞাপনে। রাজনীতিক যখন বলেন, তিনি শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে জন-গণের সেবা করবেন, তখন কেউ সে কথা বিশ্বাস করে না, এবং বক্তা নিজেও তা জানেন। তবু বলতে হয় বলে বলেন। কোনো রাজনৈতিক দল যখন ঘোষণা করে, বিপ্লব ত্বরান্বিত করাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য, তখন সেই দলেরই যে নেতার ছেলে ব্যাবসা করেন অথবা বিদেশী-সহযোগিতাপ্রাপ্ত কোমপানিতে চাকরি করেন, যাঁর নাতি ইংরেজি-মাধ্যম ইস্কুলে পড়তে যায় গলায় টাই এঁটে, তিনি জানেন ওসব বিপ্লব-টিপ্লব নেহাত ফাঁকা আওয়াজ, রক্ত গরম করে, রক্তপাত ঘটায় না, এতে ইস্কুলের বাস আটকাবে না, এবং ইস্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইনজিনিয়ারিঙ, তারপর বিদেশ, ফিরে এসে শাঁসালো চাকরি—নাতির অগ্রগতির এ পথও আটকাবে না।

রাজনীতির যে রাজপথ, তার বাঁকে-বাঁকে শত্রুপাকার হয়ে পড়ে আছে নিহত শব্দের শবদেহ। যেহেতু কথা নিয়েই রাজনীতির কারবার, এবং যেহেতু সেসব কথার পেছনে সত্যিকারের কোনো তাৎপর্যের বালাই নেই, অতএব রাজনীতির জগৎ অসাধুতার এবং কপটতার স্বর্গরাজ্য। রাজনৈতিক বক্তৃতা, রাজনৈতিক স্লোগান, রাজনৈতিক ইশতাহার, নির্বাচনের আগে ভোটদাতার কুটীরে উপস্থিত বড়ো-বড়ো নেতাদের বিগলিত বিনয়-বচন, এ সবই সেই রাজনৈতিক জগতের বিশেষ মানসিক পরিমণ্ডলে পরিপুষ্ট কপটতার ফসল।

চোখে যা দেখতে পাওয়া যায়, কানে যা শোনা যায়,

তার আড়ালে রাজনীতির আরেকটা জগৎ চিরকালই ছিল। যেমন রাজনীতি এবং রাজনীতিক ছাড়া গণতন্ত্র চলে না, তেমনি, সেই অন্তরালবর্তী জগতের ক্রিয়াকলাপ ব্যতিরেকে রাজনীতির এবং রাজনীতিকেরও চলে নি। রাজনীতি যে সর্বাংশে ঠিক সুশীল, সুসভ্য, সুবেশ ভদ্রলোকটি নয়, তার গায়ে কাদার ছিটে লাগে, তার হাতে কখনো কখনো ইটি-পাটকেলটি, এমন কি বোমাটি পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়, এ বাস্তব সত্য সকলেরই জানা। অনেকে যা জানতেন না, পুরনো আমলের রাজনীতিকেরা নিজেরাও যা হয়তো ভেবে দেখেন নি, তা হল সর্বজনমান্য বড়ো নেতার অভাবের একটা ফল যেমন অসংখ্য ছোটো-ছোটো গোষ্ঠীনেতার উত্থান, তেমনি, তার পেছন-পেছন উঠে আসেন তাঁরা, যাঁরা এতকাল ছিলেন রাজনীতির সেই আড়ালদেওয়া জগতের লোক। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এমন সব কার্যকলাপে লিপ্ত যা ঠিক আইনানুমোদিত নয়। অথচ, তাঁদেরও একটা ভূমিকা ছিল রাজনীতির জগতে। তাঁরা যদি এখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে সরাসরি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে মুখ্যচরিত্র দাবি করেন, প্রথাসিদ্ধ রাজনীতিকদের একটু মুশকিল হয় বইকি।

শ্রীঅশোক সেন বলেছেন, যারা আগে পার্টি অফিসের মেঝেতে বসত তারা এখন চেয়ারে বসতে চাইছে। তাঁর মতো বিচক্ষণ রাজনীতিকের বোঝা উচিত ছিল—এই প্রমোশনের দাবি আজ না হোক কাল উঠতই। মেঝেটা এত দিন সাফ করা হয় নি, এখন চেয়ারও আক্রান্ত।

অথচ এই মুহূর্তে আমাদের প্রধানমন্ত্রী আধুনিকতার নতুন যুগে আমাদের দেশের উত্তরণের কথা বলছেন, বলছেন সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে যাবার কথা। এখন যদি আমাদের স্থানীয় রাজনীতি খুদে মস্তান আর জুলুমবাজদের কবজা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে, তবে সেই স্থানীয় রাজনীতির ভিত্তির ওপর যে বৃহত্তর রাজনীতি, যার ওপর নির্ভর করছে সমস্ত দেশের, এবং পরোক্ষভাবে বিশ্বেরও ভবিষ্যৎ—সেই রাজনীতিরই বা ভবিষ্যৎ কী?

কৃষিবিকাশের মূলনীতি আর প্রকরণ

ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি—অশোক রুদ্র। আনন্দ পাবলিশারস প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা। কুড়ি টাকা।

আনন্দ পাবলিশারসের অর্থনীতি-গ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অশোক রুদ্র-প্রণীত আলোচ্য গ্রন্থটি। বইটি এগারোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ভূমিকাতেই লেখক বলেছেন, বইটি লেখা হয়েছে সেই পাঠকের কথা মনে রেখে যিনি জানবিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে জিজ্ঞাসু। ছাত্রপাঠ্য হিসেবে তো নয়ই, এমন-কি অর্থনীতিক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পাঠকের কথা মনে রেখেও নয়। তবুও একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে ছাত্র এবং অর্থনীতিবিশেষজ্ঞরাও এই বই না পড়ে থাকতে পারবেন না।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির স্থান আর তার বৈচিত্র্য। ১৯৮০-৮১ সালে কৃষিপণ্যের অংশ জাতীয় উৎপাদনের প্রায় শতকরা ৪২ ভাগ, এবং আমাদের দেশের কর্মীদের মধ্যে কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীদের অংশ শতকরা ৬৫ ভাগ। কিন্তু অন্য দেশের তুলনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেক কম। কৃষির অনুন্নতির একটি কারণ কৃষিযোগ্য জমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য। এর তুলনামূলক সারণিও দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষ শ্রেণীর কৃষিপণ্য উৎপাদন করে। এ বিষয়ে প্রত্যেক রাজ্যেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। উৎপাদনপদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কালের অবস্থা এবং স্বাধীনতা-উত্তরকালে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ কিভাবে ঘটেছে তা আলোচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ছয়টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়ণে বিপুলপরিমাণ সরকারি মূলধন কৃষিখাতে নিয়োজিত হয়েছে, এবং তার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটেছে নানা দিকে। ১৯৭৬-৭৭ সালে ভারতের কর্ষিত জমির পরিমাণ হল ১৪ কোটি হেকটর (মোট জমির ৪৬ শতাংশ), ১৯৭১ সালে তা বেড়ে হল ১৭ কোটি ৩৩ লক্ষ হেকটর। চাষের জমির পরিমাণবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে কৃষিপণ্যের উৎপাদনও বেড়ে গেছে। শস্যরোপণের নিবিড়তার সূচক সংখ্যা ১১১ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১৯, আর পতিত জমির পরিমাণ কমেছে ৬ শতাংশ থেকে ৩ শতাংশ। সর্বপ্রকার শস্যে নিয়োজিত জমির তিন-চতুর্থাংশ খাদ্যশস্যের চাষে ব্যবহার করা হয়। উৎপাদনবৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশি হয়েছে গম আর আলুর চাষে। ধান, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি অধিকার করেছে দ্বিতীয় স্থান। তুলো, তৈলবীজ, তামাকের স্থান তৃতীয়। তুলনামূলক সারণির সাহায্যে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। উৎপাদনবৃদ্ধির বেগ অব্যাহত আছে না মন্থর হয়েছে, এটি বিতর্কিত বিষয়। লেখক তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। লেখকের মতে, কৃষিতে উৎপাদনবৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকছে, না হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে—তা জোর করে বলার কোনো উপায় নেই।

গ্রন্থসমালোচনা

তৃতীয় পরিচ্ছেদের বিষয়বস্তু হল উৎপাদনসম্পর্ক এবং ভূমির বণ্টন। উৎপাদনসম্পর্কের মূল চরিত্রের লক্ষণ চারটি। (১) জমি এবং উৎপাদনের উপর মালিকানা, (২) জমি চাষ করে যারা তাদের অধিকাংশেরই জমির এবং উৎপাদনের উপর মালিকানা-স্বত্ব না থাকা, (৩) জোতের গড় আয়তনের ক্ষুদ্রতা, এবং (৪) ব্যক্তিগত মালিকানার জমির এবং জোতের অন্তর্ভুক্ত জমির বিষম বণ্টন। পাশ্চাত্যদেশে খামারগুলি হয় আয়তনে বিশাল এবং অধিকাংশ কর্মীই শিল্পের মজুরদের মতোই মাইনে দিয়ে রাখা শ্রমিক। এক-একটি খামার এক-একটি ধনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানবিশেষ। অপরদিকে, আধা-সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে খামারগুলি সমবায়নীতি-ভিত্তিক। সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি অনুসৃত হয় আমাদের কৃষিতে। আমাদের জোতগুলি অন্য দেশের জোতের আয়তনের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং তাদের সংখ্যাও নগণ্য। দশ হেকটরের চেয়ে বড়ো আয়তনের জোত খুবই কম। এক হেকটরের চেয়েও ছোটো আয়তনের জোত শতকরা ৫০ ভাগের কাছাকাছি। তা ছাড়া, এগুলি এলোমেলোভাবে ছড়ানো। চাষিদের বড়ো অংশই ভূমিহীন। ১৯৭০-৭১ সালে ৮ কোটি গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ১০ ভাগই ছিল সম্পূর্ণ ভূমিহীন। বাকি ৯০ ভাগের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগেরই মালিকানা-স্বত্বের পরিমাণ ছিল বড়ো জোর ১ হেকটর পর্যন্ত। তারপর, জমি কোথাও নিজে চাষ না করে মালিকেরা শ্বেতমজুর অর ভাগীদারে দিয়ে চাষ করিয়ে নেয়। আবার কিছু-কিছু মালিক নিজেরাই চাষ করেন। পরের জমি চাষ হয় মজুরিপ্রথায় অথবা ভাগপ্রথায়। এই মালিক আর উৎপাদকের মধ্যে আসেন শস্যব্যবসায়ী, দরিদ্র চাষিদের অর্থসরবরাহের জন্য মহাজন আর অন্যান্য ঋণকারবারি। ইতিমধ্যে অন্য শ্রেণী, যথা

জমিদার, যাঁরা শস্যের উপর ভাগ বসাতেন তারা আইনত বিলুপ্ত হয়েছেন।

মজুরিপ্রথা আলোচিত হয়েছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখকের একক বা অন্য কোনো গবেষকদের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালিত সমীক্ষার ভিত্তিতে। এতে দেখা যায়, ১৯৫১ আর ১৯৬১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে খেতমজুরের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এটা সারণির সাহায্যে প্রমাণ করা হয়েছে। তারপর দেখানো হয়েছে 'মালিক-মজুর' সম্পর্কের নানান দিক, যেমন চুক্তির মেয়াদ, বেতন দেওয়ার প্রথা, মজুরি দেওয়ার কালক্রম, মজুরির উপকরণ, কাজের সময়, করণীয় কাজের সীমানা, অন্য মালিকের জন্য কাজ করার স্বাধীনতা, মালিকের সঙ্গে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক যোগাযোগ ইত্যাদি। তার পর বলা হয়েছে মজুরদের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে, যেমন দৈনিক হিসাবে আবার বাৎসরিক হিসাবে। দৈনিক চুক্তির মজুরদের বলা হয় 'মুনিষ', আর বাৎসরিক চুক্তির শ্রমিকদের বলে 'মাহিন্দর'। এই দুই শ্রেণীর মাঝে আছে তৃতীয় শ্রেণী, যাদের পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে বলা হয় লাগাড়ে, হেঁটেলী, গতানে, বোটারে প্রভৃতি হরেক নামে। আর-এক রকম চাষি আছে যে মালিকের হাল-লাঙল দিয়েই মালিকের জমি চাষ করে, এবং পারিশ্রমিক হিসাবে পায় উৎপন্ন শস্যের তিনভাগের একভাগ। তারপর আছে মুচলেকাবন্ধ শ্রমিক, (বনডেড লেবারার) যা এখন আইনে নিষিদ্ধ। মজুর আর মালিকের সম্পর্কের ভিত্তি পুরাতন ঋণ, খোরাকি ধার, এবং 'অ্যালটমেন্ট' জমি। পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৬৫ জনই খোরাকি ধার দেওয়ার ভিত্তিতে মালিকের সঙ্গে সম্পর্কিত। জমি অ্যালটমেনট সূত্রে গ্রথিত ছিল শতকরা ১৮ জন মজুর। সমীক্ষানুসারে বাৎসরিক চুক্তির শর্তে ছিল খেতমজুরদের শতকরা ১১ ভাগ 'মাহিন্দর' শ্রেণীর। দৈনিক শর্তের মজুরদের পারিশ্রমিক ১৯৮০ সালেও দৈনিক ৪ টাকা বা ৬ টাকার বেশি ওঠে নি, যদিও সরকার ১৯৭৫ সালে ঘোষণা করেছিলেন দৈনিক মজুরির ন্যূনতম হার হবে ৮ টাকা ১০ পয়সা। শতকরা ৫০ ভাগের চেয়ে বেশি গ্রামেই শতকরা ৫০ ভাগের চেয়ে বেশি মজুর বেকার অবস্থায় থাকে (বিশেষ করে আশ্বিন-কার্তিক আর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে)। ধারের জন্য মজুরদের প্রধানত যেতে হয় মহাজন, জোতদার, ধান বা পাটের কারবারি আর মুদি-দোকানের কাছে। এ সম্বন্ধে লেখক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে বর্গাপ্রথা বা ভাগপ্রথা এবং ঠিকাপ্রথা সম্বন্ধে বলা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি অঞ্চলে দেখা গিয়েছিল যে, মালিক আর ভাগীদারের সম্পর্কের মধ্যে মাত্র শতকরা ৪৭ ভাগ ক্ষেত্রে মালিক ছিল ভাগীদারদের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চস্তরে অবস্থিত। আর শতকরা ২০ ভাগ ক্ষেত্রে ভাগীদারই ছিল মালিকের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর ক্ষমতাবান।

কৃষিপণ্যের বাজার সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। তার মধ্যে সরকার-কর্তৃক শস্যের ন্যূনতম মূল্য স্থিরীকরণ এবং রেশন প্রথা চালুকরণ ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, প্রয়োজনবোধে সরকার-কর্তৃক খাদ্যশস্য আমদানির ব্যবস্থা করতে হয় ন্যূনতম পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুত রাখার জন্য যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'বাফার স্টক'। একই উদ্দেশ্যে লেভির সাহায্যে বড়ো কৃষককে বাজার-দরের চেয়ে কম দামে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারের কাছে কিছু পরিমাণ শস্য বেচতে হয়। এটিও একপ্রকার কর। ছোটো কৃষককে কিছুই দিতে হয় না। লেখকের মতে, কৃষিপণ্যের বাজার নিখুঁতভাবে প্রতিযোগিতামূলক নয়, তথ্যগতভাবে।

কৃষকদের ধারদেনা সপ্তম পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষকের ঋণ নেওয়ার অর্ধেকেরই উদ্দেশ্য ছিল সাংসারিক প্রয়োজন মেটানো, এবং অপরদিকে উৎপাদনের প্রয়োজনে ঋণের অংশ ছিল শতকরা ৩৬ ভাগ মাত্র। ঋণদাতারা হলেন মহাজন, জোতদার শ্রেণীর ধনী চাষি, শস্যের কারবারি, আর মুদির দোকান। তারপরে আসে সরকারি আর সরকার-সমর্থিত প্রতিষ্ঠানগুলি যার মধ্যে আছে বেশ কিছু পুরোনো সমবায় সমিতি। লেখক ৯৭ পৃষ্ঠায় এক জায়গায় বলেছেন যে, ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতি প্রভৃতিদের ক্রিয়াকলাপের বিষয় প্রায় কিছুই আলোচনা করবেন না এইজন্য যে, এই সংগঠনগুলির দ্বারা প্রদত্ত ঋণ এ যাবৎ অধিকাংশ কৃষিজীবী মানুষের জীবনকে স্পর্শই করতে পারে নি—এই সাংগঠনিক ঋণের থেকে লাভবান হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনী কৃষক। এই প্রসঙ্গে পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, ১৯৮২ সালের জুন মাসের শেষে কৃষিকার্যের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছিল মোট ৪৫৩২.৩০ কোটি টাকা (প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ ভাবে) ১০০.৯২ লক্ষ ধার অ্যাকাউনট মারফত। ১৯৮২ সালের ডিসেমবর মাসের শেষে দেখা যায় যে, সমাজের দুর্বলশ্রেণীভুক্ত কৃষিকার্যে রত (যার মধ্যে আছে ছোটো চাষি, প্রান্তিক চাষি প্রভৃতি) লোকদের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিয়েছেন ১৪৭৪ কোটি টাকা, মোট ৬৫.৪ লাখ ধার অ্যাকাউনট মারফত। ১৯৮২-র জুন মাসে ওই ব্যাঙ্কগুলি তপশিলি আর আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত লোকদের (যাদের অধিকাংশই চাষবাসের কাজ সাধারণত করে থাকে) ৫২১ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল, ২৯

লক্ষ ধার অ্যাকাউনটে। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কগুলি সমাজের দুর্বলশ্রেণীভুক্ত লোকদের খুব অল্প সুদে ধার দিয়েছিল ৩০৫ কোটি টাকা ১৯৮২ সালের ডিসেমবর মাসের শেষে অন্তত ৩২ লক্ষ অ্যাকাউনট মারফত। তদুপরি রুর‍্যাল রিজিয়নাল ব্যাঙ্কগুলি (যাদের প্রধান কাজ গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া) ১৯৮২ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত ক্ষুদ্র চাষি, ভূমিহীন চাষি গ্রামীণ কারিগরদের ধার দিয়েছিল প্রায় ৪১৫ কোটি টাকা, যা তাদের সামগ্রিক ধারের ৯৫.৪ শতাংশ। ১৯৮১-৮২ সালে এগ্রিকালচারাল রিফিন্যানস ডেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশান ছোটো আর মাঝারি চাষিদের ধার দিয়েছিল প্রায় ৪৫৩ কোটি টাকা। রুর‍্যাল ইনটিগ্রেটেড ডেভেলাপমেনট প্রোগ্রামকল্পে বাণিজ্যিক ও সমবায় ব্যাঙ্কগুলি মিলিত হয়ে সমাজের দুর্বলশ্রেণীর জনগণকে আর্থিক ঋণ দিয়েছিল ১৯৮০-৮১ সালে ২৩৬ কোটি টাকা, ১৯৮১-৮২ সালে ৪৮৪ কোটি টাকা এবং ১৯৮২-৮৩ সালে ৭১৪ কোটি টাকা। এ ছাড়া গ্রামোন্নয়নকল্পে ১৯৮২ সালের ১২ জুলাই থেকে ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলাপমেনট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র চাষি আর প্রান্তিক চাষিদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অর্থ সাহায্য দিতে আগ্রহী হয়েছে। যদিও আশানুরূপ ফললাভ হয় নি, তবুও এসব চেষ্টা যে কিছুটা ফলপ্রসূ হয়েছে, এবং দরিদ্র কৃষককুলকে সাহায্য করছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই লেখক যে কারণে এসব প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করতে বিরত হয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়। অন্তত জিজ্ঞাসু পাঠকের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করার জন্যও এ সম্বন্ধে কিছু বলার প্রয়োজন ছিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদে ভারতের কৃষিব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক না আধা-ধনতান্ত্রিক—এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের মতে, কৃষিব্যবস্থার ধনতান্ত্রিক লক্ষণ চারটি, যথা (১) ধনিকদ্বারা শ্রমিকদের অবাধ শ্রমক্রয় এবং তন্নিয়োগে উদ্বৃত্তের সৃষ্টি, (২) পণ্যবাজারে বিনিময়মাধ্যমে উদ্বৃত্তের মূল্যায়ন এবং মুনাফার আকার গ্রহণ, (৩) উদ্বৃত্তের নিয়োগে মূলধনের সৃষ্টি এবং (৪) উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্ত শৈলীর উন্নতি। অপরদিকে প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণ হল (১) বিত্তবানদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ-সহায়ে শ্রমিকনিয়োগ এবং উদ্বৃত্তের সৃষ্টি, (২) মালিকের বাজারের মাধ্যম ছাড়াই উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা, (৩) উদ্বৃত্ত উৎপাদনে নিয়োগ না করে বিলাসব্যসন ইত্যাদিতে ব্যয় করা, এবং (৪) উৎপাদনশৈলীর নিম্নমান। ভারতের কৃষিতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেখা যায় ধনতান্ত্রিক রীতির আংশিক বিকাশ, এবং তারই পাশাপাশি প্রাক্‌-ধনতান্ত্রিক রীতির কিছু কিছু লক্ষণ। আর আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার লক্ষণ: ক্ষুদ্র আয়তনের জোতের প্রাচুর্য, করপ্রথার প্রচলন, মহাজনি কারবারের প্রাধান্য, উৎপাদনে নিম্নমান, অনুন্নত উপায়ে উৎপাদিত পণ্য, উৎপাদনে ব্যবহার্য কাঁচামালের আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে বাজারের সীমিত ভূমিকা ইত্যাদি। প্রথম তিনটি আধা-সামন্ততান্ত্রিক লক্ষণ বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদে কৃষিতে শ্রেণীবিন্যাসের বিষয় স্থান পেয়েছে। লেখক পঞ্চস্তরবিশিষ্ট শ্রেণীবিন্যাসকে ভারতের কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিরোধী। লেখকের মতে, আমাদের দেশে কৃষিকাজ দু শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা জোতদারশ্রেণী আর মজুরশ্রেণী। এই জোতদারশ্রেণীর কেউ-কেউ অধুনালুপ্ত জমিদারদের উত্তরাধিকারী। মজুরশ্রেণীতে খেতমজুরের সঙ্গে ক্ষুদ্র জোতের চাষিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে খেতমজুররা দাবিদাওয়া নিয়ে এখনও কোনো সমবেত আন্দোলনে নামে নি।

কৃষি-উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা দশম পরিচ্ছেদের বিষয়। ভূমিসংস্কার ও সমবায় সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার আইন আর নীতি রচনা করে সরকার কৃষি-উন্নয়নের গতি এবং প্রকৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছেন। আর তারপরে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে রাসায়নিক সার, সেচের জল, কীটনাশক ওষুধ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির উপর, যা উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ত্বরান্বিত করে। জমিদারিপ্রথায় বিলোপ ছাড়াও, করপ্রথা, মালিকানা-স্বত্বের ঊর্ধ্বসীমা সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন সত্ত্বেও অধিকাংশ রাজ্যেই আইনগুলো কার্যে পরিণত হয় নি। ফলে জোতদারশ্রেণী উত্তরোত্তর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। কেবল দুটি রাজ্যে করপ্রথা-সংক্রান্ত সংস্কার খানিকটা ফলপ্রদ হয়েছে। কেরালায় করপ্রথার উচ্ছেদ হয়েছে এবং দীর্ঘকাল ধরে চাষ করে আসছে যে করপ্রদানকারী চাষিরা, তাদের দেওয়া হয়েছে জমির মালিকানা-স্বত্ব। পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং অপারেশান বর্গা-নামধেয় সংস্কারের মারফত বর্গাদারদের তাদের চাষকরা জমির উপর মালিকানা-স্বত্ব না দিয়ে শুধু দখলিস্বত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রবর্তিত হল একশোটি গ্রাম নিয়ে একটি করে ব্লক সৃষ্টি যাতে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, সেচের জল ইত্যাদি কৃষকদের কাছে পেঁছানো যায়। এইসব ব্লকের কর্মীদের নাম দেওয়া হয়েছে গ্রামসেবক আর গ্রামসেবিকা। এদের কাজ হল কৃষিগবেষণালব্ধ জ্ঞান হাতে-কলমে বিতরণ করা। পরে এল 'সবুজ বিপ্লব' পর্যায় উন্নত-ফলনশীল বীজের মাধ্যমে। ক্ষুদ্র সেচের উপরও গুরুত্ব

দেওয়া হল। আমাদের দেশে বৎসরে প্রায় দেড় কোটি টন খাদ্যশস্য পোকা-মাকড়-ইঁদুরের উপদ্রবে, উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়। এ বিরাট অপচয় রোধ করার জন্য কী কী ব্যবস্থা প্রয়োজন এবং সরকার কী কী ব্যবস্থা নিয়েছেন, এ সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেন নি। কীটনাশক ওষুধ সরবরাহ ছাড়াও সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে নানা জায়গায় শস্যসংরক্ষণের জন্য গুদাম, হিমঘর ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। এ অপচয় দূরীকরণের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

একাদশ পরিচ্ছেদে লেখক আমাদের কৃষিসমস্যা আর তার সমাধানের উপায় নির্ধারণ করেছেন। প্রথম সমস্যা হল কৃষিপণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট হচ্ছে না। দ্বিতীয় সমস্যা হল কৃষিনির্ভরশীল জনগণের অধিকাংশের কর্মহীনতা আর দারিদ্র্য। শিল্পোন্নয়নের ফলে কৃষির উপর চাপ কমবে বলে আশা করা যায় না। নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করেও উৎপাদন তেমন বাড়ছে না। প্রান্তিক চাষিদের জমি এতই সামান্য যে তাদের পক্ষে উৎপাদন মারফত আয়বৃদ্ধি করা দুষ্কর। তবুও চেষ্টা চলছে। তারপর আছে ভূমিহীন চাষি। পশ্চিমবঙ্গে 'খাদ্যের বিনিময়ে কাজ' প্রকল্পে কিছুটা ফল পাওয়া গেছে। এসব প্রকল্পে, লেখকের মতে, অনেক টাকা লোপাট হয়ে যায়। ভূমির পুনর্বণ্টন করে ভূমিহীন আর প্রান্তিক চাষিকে স্বাবলম্বী করার সুযোগ সীমিত। লেখকের মতে, ঊর্ধ্বসীমা-বেঁধে-দেওয়া জমির পরিমাণের অনেক নীচুতেই যদি সীমাকে ধরে নেওয়া যায়, তবু দেখা যাবে যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করে ভূমিহীন মজুর আর প্রান্তিক চাষিদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার মতো জমি একেবারেই নেই। একমাত্র সামগ্রিক সমবায় রীতিতে সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। সামগ্রিক সমবায়নীতি বা রীতি বলতে শুধু কৃষি-উৎপাদন, উৎপাদন-সম্পর্কিত ঋণ, রসদ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা অথবা শুধু কৃষিনির্ভর শিল্প বোঝায় না, এতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে ও সমাজ-কল্যাণকে সামগ্রিকভাবে। যে-জাতীয় যৌথ উদ্যোগ চীনের কমিউনের মারফত করা সম্ভব হয়েছিল সে-জাতীয় যৌথ সমবায়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে চীনের কমিউন মারফত যৌথ উদ্যোগের বিবরণ দিলে পাঠকদের পক্ষে বিষয়টি অনুধাবন করার সুবিধা হত। কৃষি-উৎপাদনের উপাদান—জমি, শ্রম আর জল। এ তিনটির কোনোটিরই অভাব নেই আমাদের দেশে। মৃত্তিকা-সংরক্ষণ-কারী বিশেষজ্ঞদের মতে, মোট জমির পরিমাণের অন্তত ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ বনভূমিরূপে রক্ষিত হওয়া উচিত। বনভূমির অবশ্যিক আবহাওয়া এবং সেই সূত্রে ফসল-ফলনের উপরও বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে। অথচ আমাদের বনভূমির পরিমাণ আনুমানিক ১৫ শতাংশ। এই বনভূমির স্বল্পতা ফসল-উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে ব্যাহত করে। নানা কারণে কৃষিযোগ্য জমির প্রসার সংকুচিত হচ্ছে। রাসায়নিক সার প্রয়োগ ছাড়াও জমিকে অধিকতর উর্বর করতে হলে শ্রমের প্রয়োগই সমধিক প্রয়োজন। লেখকের মতে, গ্রামের জনগণ যারা ঠায় বসে আছে তারা যদি তাদের শ্রম মিলিতভাবে প্রয়োগ করে তো গ্রামের আর আশেপাশের চেহারাই আগাগোড়া বদলে যাবে। ফলে দারিদ্র্য আর কর্মাভাব থাকবে না। এভাবে গ্রামের জমির অবশ্বার উন্নতি ঘটাতে পারলে উৎপাদন যে বিশাল পরিমাণে বাড়বে, তাতে প্রত্যেকেরই যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়া-পরার পরও উদ্বৃত্ত থাকবে। কৃষির সম্প্রসারণের ফলে শিল্পেরও প্রসার সম্ভব হবে এবং গ্রামের জনসাধারণের জীবনমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। "এই ব্যবস্থায় বেকার জনগণের শ্রমপ্রয়োগে গ্রামের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটাতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা যতদিন আছে তত-দিন এই ব্যবস্থার (অর্থাৎ সামগ্রিক সমবায়নীতির) সূচনাও সম্ভব নয়।" মালিকানা-স্বত্ব যদি থাকে এবং সমবায়-ভিত্তিতে যদি কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি করা হয় তো গ্রামের বিভিন্ন লোকের তার দরুন উপকার হবে কার কতটা জমি আছে সেই অনুপাতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হয়েছে, যার একশো বিঘে জমি আছে তার বিঘে-প্রতি উৎপাদন ধরা যাক চারগুণেই বাড়বে। কিন্তু যার এক বিঘে জমি আছে তারও উৎপাদন ধরা যাক চারগুণেই বাড়বে। কিন্তু যার কোনো জমি নেই গ্রামের কৃষির উন্নতির দরুন তার তো কোনো লাভ হবে না। সুতরাং সিকি ভাগ গ্রামবাসী, যাদের কোনো জমিই নেই, তারা কেন এগিয়ে আসবে পরিশ্রম করতে? "সমপরিমাণ শ্রম দেবো অথচ কারও ভাগে আয় জুটবে এক বিঘার অনুপাতে, আর কারও ভাগ জুটবে দশ বিঘার অনুপাতে, এতে তারা রাজি হবে কেন?"

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে যা মালিকানা-স্বত্বের অবসান করতে হলে দেশের সংবিধান অনুযায়ী সরকারকে প্রতি মালিককে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমাদের মতো বিরাট দেশে ব্যক্তিমালিকানাস্বত্ব বিলোপ করার মতো অর্থসামর্থ্য সরকারের একেবারেই নেই। তাই মালিকানাস্বত্ব লোপ পাবে কি পাবে না, তা ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার গর্ভে নিহিত। এখানে প্রশ্ন ওঠে, ব্যক্তিমালিকানাস্বত্বের অবসান না হলে কৃষিকাজ সামগ্রিক ভিত্তিতে পরিচালনাও সূচনা হতে পারে না—এ কেমন কথা? লেখক ধরে নিচ্ছেন কেন লাভের অঙ্ক শুধু জমির অনুপাত অনুসারেই নিরূপিত হবে? এমনও তো হওয়া সম্ভব যে, অন্য কোনো সূত্র সর্ব-

সম্মতিক্রমে আবিষ্কৃত হতে পারে যার দ্বারা লাভালাভ নিরূপণে সমবায়ভুক্ত চাষীরা তুষ্ট হতে পারেন। লাভের দিক থেকে বিচার করলেও যাদের জমি নেই তারা সমবায়ভিত্তিক চাষে শ্রমিক হিসাবে যোগ দিয়ে সমবায়সমিতি-নির্ধারিত পারিশ্রমিক পাবেন যা এখন-কার হারের চেয়ে অধিকতর হবে এবং বাজারদর হারে ন্যায্য পারিশ্রমিকের পরিমাণের চেয়ে কম হবে না নিশ্চয়ই॥ প্রত্যেকেই যদি সমভাবে আগের অবস্থার চেয়ে বেশি লাভবান হন জমির অনু-পাত অনুসারেও, তাতেই বা কী আপত্তি থাকতে পারে? এ ব্যবস্থায় কৃষি কি উন্নততর হচ্ছে না? কাজেই মালিকানাস্বত্ব লোপ না হলে সামবায়িক ভিত্তিতে চাষাবাদের সূচনাই হতে পারে না, এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায় না। যদি তর্কের খাতিরেও লেখকের অভি-মত মেনে নেওয়া হয়, এ মুশকিলেরও আসান আছে। বড়ো চাষিদের বাদ দিয়ে ছোটো চাষিদের এবং ভূমিহীন চাষিদের (যাদের সংখ্যা সর্বাধিক) নিয়ে সমবায়ভিত্তিতে চাষাবাদ শুরু করা যেতে পারে। শ্রীনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত পল্লীসংগঠনবিভাগ গ্রামাঞ্চলে ছোটো অথবা ভূমিহীন চাষিদের নিয়েই সমবায়ভিত্তিতে কৃষিকাজ প্রথমে আরম্ভ করেছিল এবং তা ফলপ্রদও হয়েছিল। লেখক আগের চেয়ে চীনদেশের কৃষি-ব্যবস্থা কথা কিছু বলেছেন। সেদেশে ইদানীংকালে প্রতি কৃষককে উৎপন্ন শস্যের একটা নির্ধারিত অংশ সরকারের হস্তে অর্পণ করতে হয় এবং ওই নির্ধা-রিত অংশের চেয়ে যদি বেশি উৎপন্ন করা যায় তা উৎপন্নকারী চাষি নিজের ভোগের জন্য রেখে দিতে পারে অথবা বাজারে বিক্রিও করতে পারে। কাজেই সেই দেশেও অবশ্যানুসারে উদ্বৃত্ত শস্যের মালিকানাস্বত্ব আজকাল উৎপা-দনকারী কৃষকের উপর বর্তায়। এই সুবিধা দেওয়া হচ্ছে অনুপ্রেরণা হিসাবে যাতে কৃষকেরা অধিক শস্য উৎপাদন করতে প্ররোচিত হয়। আগে বলা হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব লোপ করতে হলে সরকারকে উপযুক্ত ক্ষতি-পূরণ দিতে হবে। যদি ভবিষ্যতে সর-কার এরূপ কাজে অগ্রসর হয়, তবে জমির মালিক হবেন সরকার। এ অবস্থায় যে চাষাবাদ হবে সেটা চলবে সরকারের নির্দেশে আর পরিচালনায়, যেমন রাশিয়া এবং অন্যান্য সাম্যবাদী দেশগুলিতে হচ্ছে। জমি একবার রাষ্ট্রা-ধীন হলে লেখক-পরিকল্পিত সমবায়-ভিত্তিক চাষের অস্তিত্ব থাকবে কি? তখন তো হবে রাষ্ট্রপরিচালিত 'কালেকটিভ ফার্মিঙ'॥ শেষোক্ত কৃষি-প্রথায় রাশিয়াকে বিপক্ষ কয়েক বৎসর যাবৎই প্রয়োজনানুরূপ শস্যোৎপাদনে ব্যর্থ হয়ে বিদেশ থেকে ঘাটতি খাদ্য-শস্য আমদানি করতে হচ্ছে। কিছু-কিছু বিষয়ে সেখানে এককালে বিলুপ্ত ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব উদ্যমশীলতার পুরস্কার হিসাবে ব্যক্তিবিশেষকে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই ব্যক্তিগত মালিকানাস্বত্ব যে কৃষিকার্যের উন্নতির পথে অন্তরায়, তা স্বীকার্য নয়। এই মালিকানাস্বত্ব-সম্বলিত চাষেও আমাদের দেশে প্রায় ১৫১ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে, যা সত্যই প্রশংসনীয়।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, লেখকের পরি-কল্পনানুযায়ী চাষাবাদ হলে কৃষি-নির্ভরশীল জনগণের দারিদ্র্যমোচন হবে এবং তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে। এখানে রবীন্দ্রনাথের কথাটি মনে রাখতে হবে—আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে, যেমন রাতের বেলা দীপ জ্বালা-বার আগে দিনের বেলায় সলতে পাকা-নো। সেইমতো দারিদ্র্য দূর করতে হলে, বিশেষজ্ঞ ডাইনারের মতানুযায়ী, সর্বপ্রথম তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে, যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর খাদ্য। স্বাস্থ্য মূলগতভাবে খাদ্য আর পুষ্টির উপর নির্ভর করে। ভারতের লোকেরা যে খাদ্য খায় তা থেকে দৈনিক ১৮০০ ক্যালরি মাত্র উৎপন্ন হয় যা অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। গ্রামের মানুষের ২৪০০ ক্যালরি আর শহরের লোকের ২১০০ ক্যালরি উৎপাদনকারী খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য কেন-বার সামর্থ্য না থাকলেই তাকে দারিদ্র্য বলে অভিহিত করা হয়। প্রয়ো-জনীয় খাদ্য না খেলে কর্মশক্তিই বা আসবে কোত্থেকে? তদুপরি, ৫,৭৫,৯০০ গ্রামের জন্য আছে মাত্র ৬,৪০০ স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তা ছাড়া অনেক স্বাথ্যকেন্দ্রে কোনো ডাকতারই নেই। এই তো আমাদের অবস্থা! স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের সঙ্গে প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার যা গ্রামাঞ্চলে নিতান্ত মন্থরগতিতে। কৃষি উন্নয়নে কর্মদক্ষতা আর প্রযুক্তিবিদ্যা বাড়াতে হলে নিরক্ষরতা দূর করে কৃষি-জীবীদের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এ জন্য চাই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার অর্থাৎ মৌখিক বা লিখিত শিক্ষার সঙ্গে হাতের কাজ যুক্ত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ জমি আর কৃষকের উৎপাদনশীলতার অপকর্ষ। জমি আর কৃষির উৎপাদনশীলতা আরও বাড়াতে হলে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ প্রয়োজন এবং এটা শিক্ষার মাধ্যমেই সফল হতে পারে। যদিও বহুদিনের চাষাবাদের ফলে কৃষকেরা ফসলের মাটির গুণাগুণ সম্বন্ধে মোটা-মুটি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তবুও সরকারের উচিত বিশেষজ্ঞব্যবস্থায় ফসলের জমির গুণাগুণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখা এবং কোন্ জমিতে কোন্ ফসল বেশি উৎপন্ন হতে পারে সে সম্বন্ধে কৃষকদের অবহিত করা, এবং তদনুসারে কৃষিকাজ পরিচালনা করতে সাহায্য করা। বিশেষ করে জরুরি হল কৃষিগবেষণাগারগুলিতে যেসব তথ্য এবং ফল উদ্ভাবিত হয়েছে তা কৃষিজীবীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া

যার সাহায্যে কৃষি উন্নীত হতে পারে। এর সঙ্গে দরকার সেচব্যবস্থার অধিকতর বিস্তৃতি।

আর-এক সমস্যা কৃষককুলের বেকারি দূর করা। সাধারণত বছরের ছয় মাস তাদের কোনো কাজই থাকে না। এ সময়ের মধ্যে তাদের নিযুক্ত রাখার জন্য অন্য ফসল ফলানো সম্ভব কিনা তার উপায় উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বর্তমানে ফুলচাষ, মৎস্যচাষ, মুরগিপালন, পাখিপালন ইত্যাদি প্রকল্পে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে অর্থসাহায্য নিয়ে এরূপ ফলপ্রদ কাজে নিজেদের নিযুক্ত রাখতে পারে। এ ছাড়া অবসর সময়ে তাদের কুটিরশিল্পের সঙ্গেও যুক্ত রাখতে হবে। বর্তমানে কুটিরশিল্প হিসাবে তাঁতশিল্পের প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। যদি গ্রামের ভিতরই কুটিরশিল্পরূপে ছোটো-ছোটো সুতার কল স্থাপন করা হয় তা হলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে। বিশেষ করে 'গ্রীড' লাইনের পাশে যেখানে সহজে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, সেখানে সুতার কল সহজেই স্থাপন করা সম্ভব। তবে এ-জন্য নিজেদের জমিতেই তুলো জন্মাতে হবে। এককালে বঙ্গদেশে আখ আর তুলোর চাষ হত। এখনই বা হবে না কেন? এ ছাড়া সরিষার চাষ, সরিষা তৈল উৎপাদনের জন্য কুটিরশিল্পরূপে ছোটো ছোটো ঘানি স্থাপন করা যায়। আরও স্থাপন করা যায় ফলমূলসংরক্ষণ-শিল্প, জ্যাম, জেলি, সিরাপ, আচার, ভিনিগার, গ্লুকোজ, মাখন, পনির, দুগ্ধোৎপাদন, কনডেনসড মিলক, মারগারিন শিল্প, জুতো তৈরি, সাবান-শিল্প, বিস্কুট, পাউরুটি, লজেনস, কৃষির যন্ত্রপাতি শিল্প, ছুরি-কাঁচি শিল্প, গুড়, কাগজশিল্প, চামড়ার ব্যাগ তৈরি, বাটিকের কাজ, নকশি কাঁথা সিলান, বুরুশ শিল্প, ক্যাম্বিশ ও চট-জাত নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতকারী শিল্প, দড়ি তৈরি, কাঠের আসবাব নির্মাণ শিল্প, খেলনা বা মৃত্তিকাজাত শিল্প ইত্যাদি। এ ছাড়া কৃষিজীবীদের জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অবহিত করাও প্রয়োজন। এ পর্যন্ত ধনী চাষিদের আয়করের আওতায় আনার অনেকবার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে এ পর্যন্ত তারা অব্যাহতি পাচ্ছে। তাদের উপর আয়কর চাপানো হলে সেই করলব্ধ অর্থ ছোটো চাষি আর ভূমিহীন চাষিদের অবস্থার উন্নতির জন্য এবং কৃষি-উন্নয়ন খাতে ব্যয় করা যেত। আমাদের গলদই এই যে যেখানেই রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেখানেই যে-কোনো প্রতিষ্ঠানের অপকর্ষ হয়েছে। রাজনৈতিকপ্রভাবমুক্ত, নিঃস্বার্থ, জনকল্যাণে উদ্বুদ্ধ, 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে' মন্ত্রে দীক্ষিত একদল কর্মী যদি সমবায়-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়, তবে সমবায়-ভিত্তিতে চাষ করার আর চাষের সুফলপ্রাপ্তি বিষয়ে আশা পোষণ করা যায়।

বীরভূম জেলার বোলপুরের কাছে ছোটো শিমুলিয়া গ্রামকে কেন্দ্র করে অজয় নদের তীরবর্তী নটি গ্রাম নিয়ে শ্রদ্ধেয় পান্নালাল দাশগুপ্ত মহাশয়ের নেতৃত্বে একটি সার্বিক গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। তার সুফল সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে। এই পরিকল্পনা পর্যবেক্ষণ করে হয়তো অনেক কিছু জানা যাবে যা ভবিষ্যতে কৃষি-উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হবে।

বইটির পাতায় যে যে স্থান ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত, পাদটীকায় ইংরেজি শব্দগুলিকে 1, 2, 3 ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত না করে বাঙলাতে চিহ্নিত করলেই উপযুক্ত হত। বইটি পড়ে আমাদের দেশের কৃষিপদ্ধতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। বইটির সমীক্ষাও তথ্যভিত্তিক, এবং ভাষাও বেশ ঝরঝরে।

অনিলকুমার বসু

রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের নববীক্ষা

রবীন্দ্রগল্প : অন্য রবীন্দ্রনাথ—ক্ষেত্র গুপ্ত। গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-৯। শ্রাবণ, ১৩৯১। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রসম্পর্কিত আলোচনার প্রাচুর্য যে-কোনো মানের স্রষ্টার পক্ষে ঈর্ষণীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা বিচিত্রগামী বলে কেউ ঈর্ষা প্রকাশ করেন না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো এত বড়ো মাপের শিল্পী বাঙলা সাহিত্যে আজো আবির্ভূত হন নি বলেই এ ব্যাপারে কেউ চিন্তাও করেন না। তবু, রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্য যে-কোনো শাখার তুলনায় তাঁর ছোটোগল্প সম্বন্ধে আলোচনা কম। এমনকি রবীন্দ্রনাটকও এক্ষেত্রে সমালোচকদের দৃষ্টি বেশি আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের উপর আলোচনা হয়েছে কম। তাঁর ছোটোগল্পের উপর অল্প যে-কখানি বই আছে তাদের বেশির-ভাগ জুড়ে আছে এসব গল্পের পটভূমিকা—যা রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গবাসের সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত। এ ছাড়া পাওয়া যায় তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এ-জাতীয় বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কখনো-কখনো সমালোচকের বিশেষ মনোভঙ্গি কাজ করে বলে মূল লেখকের স্থান দখল করে থাকেন সমালোচক নিজে।

এসব দিক বিচার করে দেখলে ক্ষেত্র গুপ্ত-রচিত এই বইখানিকে ভিন্নধর্মী আলোচনাগ্রন্থ বলে আখ্যায়িত করা যায়। লেখক রবীন্দ্রগল্প আলোচনার গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করেন নি। 'ভূমিকার বদলে' -নামক প্রস্তাব ১-এ তিনি এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলছেন, "এই লেখায় আমি কোন জাতের ভূমিকাই করছি না। অন্য ভঙ্গিতে চলব ঠিক করেছি। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি যেমন লেখা বা ছাপা হয়েছে, সেইভাবে পর পর পড়তে পড়তে ভাবছি এবং ভাবতে ভাবতে পড়ছি। অন্য সমালোচকদের যেসব চিন্তায় বিশ্বাস করে এসেছি তাতে ফাটল ধরতে পারে; এমনকি সাধারণভাবে পড়বার সময়ে যেসব বোধ আমার মনে দানা বেঁধেছিল তাও ভেঙে যেতে পারে।" এজন্যে তাঁর সিদ্ধান্ত হল, "গল্পগুলোকে এক-একটি করে নাড়াচাড়া করব প্রথম। শব্দে এবং রূপে-ধরা জীবনকে শব্দ এবং রূপের মধ্যেই খুঁজতে হবে। তাতে গল্প দর্শন হয়ে পড়ার বিপদ থেকে বাঁচবে এবং আলোচক আমার ব্যক্তিক প্রবণতা প্রশ্রয় পাবে না।"

যে মনোভাব নিয়ে লেখক রবীন্দ্রগল্পের অলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার ছাপ পুরো বইটির ছত্রে-ছত্রে বিদ্যমান। এই আলোচনার প্রধান অবলম্বন গল্প—গল্পকেন্দ্রিক ভাবনা বা আবিষ্কার নয়। তবে লেখক যে কিছুই আবিষ্কার করেন নি, তা নয়। সেই আবিষ্কারে প্রাধান্য পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর আলোচক নন।

লেখক অধ্যায়গুলোকে 'প্রস্তাব' হিসেবে উপস্থাপনা করেছেন। নয়টি প্রস্তাবে বইটি বিভক্ত। যথা, ভূমিকার বদলে; গল্পগুচ্ছ ১-২ ; গল্পগুচ্ছ ৩ ; আরও কিছু গল্প ; লিপিকা ; সে ; তিন সঙ্গী ; গল্পসল্প ; সিদ্ধান্তের দিকে। এই বিভাগ সম্পর্কে আলোচকের একটা কৈফিয়তও রয়েছে—যা তিনি শেষ প্রস্তাবে উল্লেখ করেছেন। এই অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পরচনার একটি কালানুক্রমিক তালিকাও দেওয়া হয়েছে। এই তালিকার সাহায্যে কবির গল্পরচনার গতি উপলব্ধি করা সহজ হতে পারে।

লেখক কোনো সার্বিক আলোচনা করেন নি। প্রত্যেকটি গল্প তিনি আলাদা-আলাদা আলোচনা করেছেন, এবং কিছু-কিছু গল্প বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আলোচনায় গল্পের নানা দিক পর্যবেক্ষিত হয়েছে, তবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ভাষাপ্রয়োগের উপর। এ ছাড়া, গল্পের ভাষা এবং ভাবের ক্রমবিকাশ দেখানোর জন্যে লেখক কিছু-কিছু ছক ব্যবহার করেছেন। কিছু-কিছু ছক হয়তো কারো কারো দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব। এসব গুরুত্বপূর্ণ ছকের ভিতর 'খাতা' (৯০ পৃ), 'দালিয়া' (২৭ পৃ), 'নিশীথে' (১১৬ পৃ) উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগুপ্ত কোনো-কোনো গল্পকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক তথা সামাজিক চিন্তা সম্পর্কে কিছু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যেমন, 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের আলোচনায় এক স্থানে তিনি বলেছেন, "তার 'বালকের মতো' 'পাগলের মতো' পুলিশ সাহেবকে মারতে আরম্ভ করায় যেন পরবর্তী কালের নির্বিবেচক, আত্মদানে উন্মুখ বিপ্লবী তরুণদের অস্ফট সূচনা লক্ষ্য করা যায়।" (পৃ ৯৮) ; অথবা ; "গল্পের রাজনৈতিক চরিত্র স্বচ্ছ, দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী।" (পৃ ৯৮); কিংবা, 'দুরাশা' গল্প প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্প্রদায়নিরপেক্ষ চিন্তার প্রশস্তিসূচক বাক্য—"আসলে কেশরলালকে নিয়ে ও-জাতীয় কোন সাম্প্রদায়িক ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া লেখকের লক্ষ্য ছিল না—গৌরবে ও পতনে একটি অসাধারণ (দেশপ্রেম আর বীরত্বে) এবং সাধারণ (ধর্মাচারে) মানুষের দিকেই তাঁর দৃষ্টি ছিল।" (পৃ ১৫৫) ; কিংবা, 'স্ত্রীর পত্র'র শরৎ প্রসঙ্গে "এ শুধু শরতের অল্প বয়সের উগ্রতা নয়, প্রচলিত সমাজবিধির প্রতি রাজনীতি-সচেতন যুবশক্তির ক্রোধ। গল্পকার যেমন ব্যাধির কেন্দ্র দেখেছিলেন উপশমের আশার সম্ভাবনার দিকেও ক্ষণিক দৃষ্টিপাত করেছেন।" (পৃ ২২০) ; কিংবা, 'বদনাম' গল্পে বিধৃত জনসংযোগ প্রসঙ্গে উক্তি : "বৃদ্ধ লেখক জেনেছিলেন এদেশের জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিক কমিউনিকেশনের ওটাই বড় রাস্তা। এ পথ মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদে আসেনি বলে রচনায় ব্যঙ্গের ছোঁয়া লেগেছে, কিন্তু তার গুরুত্ব" কমেনি। (পৃ ২৩৭)—ইত্যাদি বহু বাক্যে ক্ষেত্রবাবু রবীন্দ্রমানসের একটা বিশেষ দিক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 'মুসলমানীর গল্প' প্রসঙ্গে আলোচকের পর্যবেক্ষণ : "এ গল্পে কিছু দুঃসাহসিক কাজ আছে। শেষ শয্যায় শুয়ে এ-কাজ করার স্পর্ধা মহাকবির পক্ষেই সম্ভব। হিন্দু মুসলমান বিবাদ তখন তুঙ্গে ; কিছু কাল আগেই লাহোর সম্মেলনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান বিষয়ে প্রস্তাব নিয়েছে। তখন কিনা রবীন্দ্রনাথ এক হিন্দু নারীর স্বেচ্ছায় মুসলমান হবার কাহিনী লিখলেন হিন্দুত্বের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এই ছিল তাঁর বিদ্রোহ। আসলে ধর্মান্তর গ্রহণই লক্ষ্য নয়—প্রবল আলোড়ন ঘটিয়ে মানবিক আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই গল্পের মর্মবাণী।" (পৃ ২৩৯)

এই গ্রন্থে লেখক রবীন্দ্রগল্পকে পাঠকের সুখবোধ্য করে তুলতে চেয়েছেন। এজন্যে কখনো তিনি ভাষাকে অবলম্বন করেছেন, কখনো ভাবকে ;

আবার কখনো-কখনো এসব গল্পে তিনি আবিষ্কার করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের সার্বিক চেতনাকে। আলোচকের এই সিদ্ধান্ত তাই যথার্থ; "রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রেম আর প্রকৃতি যে-রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, কবিতা গান নাটক প্রভৃতির সঙ্গে তার পার্থক্য আছে।......"রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে "প্রেম বিচিত্র চেহারায় এসেছে—ঘৃণায়-অপ্রেমে-স্বপ্নে-হিংসায়-মাধুর্যে-আত্মদানে-বিকারে। পাপপুণ্য ভালোমন্দের বিচার যেমন থেমে গেছে, তবুও এখানে ঢোকার পথ পায়নি।" (পৃ ৩১৯)

এই গ্রন্থ থেকেই পাঠক এক 'অন্য রবীন্দ্রনাথে'র খোঁজ পেতে পারেন।

রশীদ আল ফারুকী

উপন্যাস কি কেবলি ছবি ?

ইচ্ছা অনিচ্ছা—সমীরকুমার রায়। দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭৩। আট টাকা।

আক্রান্ত—সোমনাথ ভট্টাচার্য। মৌসুমী প্রকাশনী। কলকাতা-৯। বারো টাকা।

ট্রোফি—নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়। রূপা, কলকাতা-৭৩। পনেরো টাকা।

উপন্যাস কি কেবলি ছবি—সমকালীন জীবনের ছবি, না, তার চেয়ে কিছু বেশি: এ প্রশ্ন উপন্যাসপাঠককে মাঝে-মাঝে ভাবায়। অবশ্য সব পাঠককে ভাবায় না। আর সে কারণেই টানা গল্পের বই বাজারে বিকোয়। জীবন সম্পর্কে কোনো বোধ বা অনুভূতি কোনো গদ্য-আখ্যানমাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে যায় কিনা তা কি সব সময়ে বিবেচ্য? ভাগ্যিস, বিবেচ্য নয়। তাই উপরি-উক্ত বইগুলি ছাপা হয়েছে।

'ইচ্ছা অনিচ্ছা' সমকালীন জীবনের এক-টুকরো ছবি। বলা বাহুল্য, লেখকের কলম অপটু, জীবনবোধ অপরিণত। অরিন্দম-ত্রিদিব-মল্লিকা-শ্রাবন্তী-শীলা-কমলেশ, তাদের মা বাবা কাকা পিসি। চেনাজানা মানুষ, এই নিয়েই মফস্‌সলের নিস্তরঙ্গ জীবন। ভালোবাসার সাফল্য আর ব্যর্থতার ছবি। নিষ্ক্রিয় নায়ক অরিন্দম জীবনে ভাগ্যকে মানে। তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকে। তাই স্ত্রী শর্মিষ্ঠা তাকে ছেড়ে যায়, শ্রাবন্তীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়। এই আর-কি!

সোমনাথ ভট্টাচার্যের 'আক্রান্ত' উপন্যাসে রহস্যের উপাদান আছে। সদাগরি অফিসের মেজো অফিসার সরিৎকে নিয়ে গল্প তেমন দানা বাঁধে নি। মাঝে-মাঝে ভুতুড়ে টেলিফোন আসে, ভেসে আসে কুকুরের গম্ভীর গর্জন। সরিতের অফিস আর ব্যক্তিগত জীবন, এ দুয়ের মধ্যে নানা বিরোধে সে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। বনশ্রীকে নিয়ে তার জীবন সুখের নয়, অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব। অফিসে একই ব্যাপার। দেড়শ পৃষ্ঠায় 'মিসফিট' সরিতের যৌনবাসনা, আস্পৃহা, কর্ম-জীবনের ত্রাস, শঙ্কার নানা ছবি। এরই মধ্যে সে ঘুরপাক খায়। খেতেই থাকে।

'ট্রোফি' পড়তে গিয়ে অনিবার্য মনে পড়ে মতি নন্দীর 'কোনি', 'স্ট্রাইকার'। মতি নন্দী দেখেছেন পুরুষের চোখ দিয়ে। নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন নারীর চোখ দিয়ে। তাই প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু কী করলে স্পোর্টসওম্যানকে নিয়ে কাহিনী স্বাদু আর বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে, সেই কৌশল লেখিকার অনায়ত্ত। তার ফলে আমরা পেয়েও পেলুম না একটি জীবনসংলগ্ন কাহিনী। এক নিঃশেষিততৈল অভিজাত পরিবারের মেয়ে কুসুমিতা ওরফে কুসমি বেরিয়ে এসেছিল বাইরের জগতে। অনেক পারিবারিক হার্ডল পেরিয়ে এসে কুসমি মাঠে দৌড়-প্রতিযোগিতায় জিতেছে, হেরেছে। ওলিম্পিকের মোহ তার চোখে স্বপ্নের কাজল মাখিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারে নি। তার জন্য সে যতটা দায়ী ততটাই দায়ী লেখিকা। স্তাবকের ভিড়, প্রতিযোগিতার উত্তেজনা, দর্শকের করতালি পেরিয়ে-পেরিয়ে কুসমি হঠাৎই মুখোমুখি জীবনের এক অসামান্য অভিজ্ঞতার সামনে—তার নাম প্রেম। কিন্তু তার আবির্ভাব এবং পরিণতির কোনো বিশ্বাস্য ছবি পেলাম না। দুশ বা চারশ মিটার দৌড়ের শেষ ল্যাপে যেমন অগ্রবর্তী প্রতিযোগী হুমড়ি খেয়ে পড়ে, শেষ ল্যাপে এই কাহিনী তেমনি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পাকা দৌড়বীর যেমন সামলে নেয়, দম ধরে রাখে শেষ ল্যাপের জন্যে, অনভিজ্ঞ তেমন পারে না। আফশোস, এই লেখিকা ব্যক্তিজীবনে দৌড়বীর হয়েও উপন্যাসে শেষকালটা হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কুসমির জীবনে প্রেম আর স্পোর্টস-এর একটা দ্বন্দ্ব দেখতে পাব ভেবেছিলাম। সে আশা পূরণ হল না।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

যখন 'ছোটো বড়ো হইয়া দেখা দেয়।'

প্যারাসাইট—আদিত্য সেন। ভারতী সেনগুপ্তা, জে ১৮৬৯ চিত্তরঞ্জন পার্ক, নতুন দিল্লী ১১০ ০১৯। ত্রিশ টাকা।

সাহিত্য-রচনার উপাদান ভাষা; সাহিত্য বাঙ্ময় বিগ্রহ, আর সেই বিগ্রহ জীবনের-ই একটি সুপ্রকাশিত রূপ। জীবনের নানা লীলা গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে; আকারে-ইঙ্গিতে; রূপকে-প্রতীকে; ভাবে আর ভাবনায়; কখনও শব্দের ব্যঞ্জনায়; কখনও বা অর্থে; কখনও স্থিরচিত্রে; কখনও ঘটনার গতিচ্ছন্দে; কখনও রূপবর্জিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে; কখনও দুর্ভাগ্যজনিত মানস-কণ্ডুয়নজাত নানা মতবাদের ভূমিকা আর আবিলতায় প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়। একালের কিছু-কিছু সাহিত্যিক ব্যক্তিগত খেয়ালের বশে এত বেশি অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের ইডিয়োসিনক্রেসি কতগুলো মতবাদের আবর্জনাকে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, সেই আগুনের ধোঁয়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন হচ্ছে, আবর্জনার দুর্গন্ধ পরিবেশকে দূষিত করছে। এই-সব সাহিত্যিক গল্প লেখেন, উপন্যাস লেখেন, কাব্য-নাটক রচনার সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। সাঁতার না জেনে ঝাঁপ দিলে পরিণতি যা হবার তাই হচ্ছে। এঁরা বেমালুম ভুলে যান, কিংবা আদৌ জানেনইনা যে, যা সত্যিকারের সাহিত্য, তাতে মানুষ শুধুই মনোবিলাসের আনন্দ পায় না, মানুষের চিত্ত গভীরভাবে আশ্বস্ত হয়। এর ফলে সাহিত্যে, বিশেষ করে উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে ব্যভিচার চলছে, ক্ষেত্রবিশেষে তার শোচনীয় পরিণাম কী হতে পারে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি এইরকম—"সকল মানুষের বিচারবুদ্ধি বড়ো নয়, সকল সমাজও বড়ো নয়, এবং এক-একটা সময় আসে, যখন ক্ষণিক ও ক্ষুদ্র মোহে মানুষকে ছোটো করিয়া দেয়, তখন সেই দুঃসময়ের বিকৃত দর্পণে ছোটো বড়ো হইয়া দেখা দেয়, এবং তখনকার সাহিত্যে মানুষ আপনার ছোটোকেই বড়ো করিয়া তোলে—আপনার কলঙ্কের উপরেই স্পর্ধার সঙ্গে আলো ফেলে। তখন কলার বদলে কৌশল, গৌরবের জায়গায় গর্ব, এবং টেনিসনের আসনে কিপ্‌লিঙের আবির্ভাব হয়।"

আমার বিশ্বাস অধুনা বেশ-কিছু শৌখিন লেখকের প্রাদুর্ভাবে বাঙলা সাহিত্য, বিশেষ করে উপন্যাস, মারাত্মক পীড়নে জর্জরিত। জগৎ বা প্রকৃতির তরঙ্গলীলার মধ্যে যে-চিরপ্রবহমান জীবনধারা রয়েছে সেই জীবনধারাকে উপেক্ষা করে একটা খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশকে নিয়ে কতগুলো কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে সাহিত্যচর্চায় যাঁরা নেবেছেন তাঁরা হয় ইন্দ্রিয়বিকারের উত্তেজনায় নয়তো স্বমত-প্রতিষ্ঠার অধীরতায় অস্থির হয়ে ছাইভস্ম লিখে চলেছেন। এঁদের স্মরণ করিয়ে দিই জনৈক পাশ্চাত্য সমালোচকের কিছু বক্তব্য—"নো থিয়োরি অব লাইফ, নো ড্রেপারি অর স্টেজ প্রেজেনটমেনট অব লাইফ, বাট লাইফ ইটসেলফ ইজ দ্য পোয়েটিক রিয়্যালিটি।" এই সত্যটি উপলব্ধি না করে যাঁরা গড্ডালিকার মতো পাগলামির অনুবর্তন করে চলেছেন তাঁদের জন্য দুঃখ হয়।

এই কথাগুলো আদিত্য সেনের 'প্যারাসাইট' উপন্যাস পড়ে মনে হয়েছে। বাঙালির অবক্ষয়জনিত সমস্যা আদিত্যবাবুকে ভাবিত করেছে; উত্তম কথা। কিন্তু স্বাতী বিশ্বাস আর অমরেশ রায়ের সুদীর্ঘ আলোচনার সঙ্গে আদিত্যবাবুর ভাবিত হওয়ার সম্পর্কটা তো জানা গেল না। স্বাতী বিশ্বাস যদি এ বানডল অব কোয়েশ্চনস বা এক-বোঝা প্রশ্নের স্তূপ হয়ে থাকে তবে অমরেশ রায়কে যেন সেই বোঝার বশংবদ তলপিদার মনে হয়। তা ছাড়া গোটা উপন্যাসে (এটিকে আদৌ উপন্যাস বলা চলে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ আছে) অমরেশ রায়ের সঙ্গে লেখকের অভিন্নতা বড়ো বেশি দৃষ্টিকটু। সংলাপের দুর্বলতা আর অসংলগ্নতা ভাব আর ভাষাকে পীড়িত করেছে। 'একা এক যখন একটু মৌজ ক'রে থাক্‌তে চাই', 'পার্ক স্ট্রীটের এক হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা', 'নাকের অগ্রভাগে অনমনীয় জেদ', 'ব্যুরোক্রাটদের মত দুপুর-দাপুর মন্তব্য', ইত্যাদির সমাবেশে আদিত্যবাবুর লেখা আড়ষ্ট। ১৯৭৭ সালে 'কোম্পানী আমলের সময়' ভাষার এক অভিনব উদাহরণ।

ওয়াটসন সাহেব এক জাহাজ তৈরির কারখানার জন্য প্রায় এক লক্ষ আশি হাজার পাউণ্ড খরচ করেছিলেন, ১৮৫৩ সালে ডালহৌসীর 'বিখ্যাত (?) প্রতিবেদন', ট্রেভেলিয়নের ১৮৬৫ সালের বাজেট প্রসঙ্গে শুধু বইটির কলেবর বৃদ্ধি করেছে। সবথেকে হাস্যকর হয়েছে লর্ড মেয়োর নাম বাংলায় লেখা হয়েছে 'মেয়াও'।

"স্বাতীর স্বাদ ও সৌরভ একটু আলাদা, কিন্তু ওর যে এত বড় একটা ভাবনা-রাজ্য আছে, তা বুঝেও আমি বেশ্যাবাড়িতে যেন ভোগ করতে গিয়েছি ....আমার শরীর চেতনা মাগির পায়ে লুটিয়ে পড়ে রইল" ইত্যাদিকে অশ্লীল বলব না? সৌন্দর্যলালসাহত,

অতি দুর্বল এফিমিনেট পুরুষে অমরেশ রায় আদিত্যবাবুর কৃপায় ফ্রাঁক অব নেচার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতিকর্ষিত মনোবৃত্তির বশে আধুনিক অনেক মানুষই রসবোধের অভাবে একরকম দ্বিপদ ও ঊর্ধ্বশির জীব হিসেবে দাপাদাপি করছেন। রচনার উৎকর্ষের ওপর গ্রন্থের উৎকর্ষ নির্ভর করে। ভালো সাহিত্যিক-রচনার রসরূপ মুখ্য, আর সব লক্ষণই গৌণ। আদিত্যবাবুর বইটিতে রচনার মর্যাদার অভাবে বিষয়-বস্তুরও যথেষ্ট মর্যাদাহানি হয়েছে। 'প্যারাসাইট' যে কোন্ জাতীয় রচনা তা বলা মুশকিল। অনেক চিন্তার অসংলগ্ন সমাহারকে কী বলা যায়? বইটির আদ্যোপান্ত কতগুলো সংবাদ-সংগ্রহের কর্মকাণ্ড আছে, আর আছে যখন তখন অকারণ ব্যক্তিগত ক্ষোভের প্রকাশ।

জীবনবল্লভ চৌধুরী

এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'নির্মলকুমার বসু' প্রবন্ধে কিছু-কিছু শব্দের এবং বাক্যাংশের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। সংশোধনগুলি পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম ছ মাস

১৯৮৪-র নির্বাচনের পর, চতুর্দিকে যখন রাজীবের জয়জয়কার, তখন, নির্বাচনের দুদিন পরে কংগ্রেস সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি বললেন, দলের এই জয়লাভ, একেবারে মাটির কাছাকাছি যেসব কর্মীরা, তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফল (ইনডিয়া টুডে, ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৫)। এই ক মাসে আমরা জেনেছি, শ্রী রাজীব গান্ধী হঠাৎ-বড়োলোকের মতো অশোভনভাবে নিজেকে জাহির করবার মানুষ নন। তা ছাড়া, ওইরকম একটা উপলক্ষে নিজেকে খাটো করে দলকে বড়ো করা শুধু রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় নয়, রীতিসম্মতও বটে। তবু, কংগ্রেসের সর্বনিম্ন স্তরের কর্মীদের প্রতি শ্রী গান্ধীর এই কৃতজ্ঞতা-স্বীকার যদি শুধুমাত্র মৌখিক সৌজন্যের প্রকাশই না হয়ে থাকে, রাজনীতিতে সাফল্যের মূল আসলে কোথায় নিহিত, সে বিষয়ে যদি সত্যিই তিনি অবহিত হন, তাহলে আশা করা যায়, এতদিনে আবার দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলকে জাতীয় জীবনে দৃঢ়মূল করার চেষ্টার সূত্রপাত আমরা দেখতে পাব। গত ছ মাসে সেরকম কোনো লক্ষণ অবশ্য চোখে পড়ে নি, তবে আগামী ছ মাস কি এক বছরে দলের সভাপতি যদি এদিকে নজর দেবার সময় পান, তাতে শুধু দলেরই নয়, পরোক্ষভাবে দেশেরও মঙ্গল।

নির্বাচনে জিতে অবিসংবাদিত কর্তৃত্বসহকারে রাজীব গান্ধীর ক্ষমতা হতে নেওয়ার পর প্রথম ছ মাস এই জুনে পূর্ণ হল। কাজকর্মের হিসেব-নিকেশের পক্ষে বর্ষপূর্তি একটা উপলক্ষ বলে আমরা মনে করি, অর্ধ-বর্ষপূর্তি তেমন কিছু নয়। তবু, অন্তর্বর্তিকালীন চলতি হিসেবের মতো একটা কিছু দাঁড় করাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সেই হিসেবের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী-রূপেই তাঁর কার্যকলাপের কথা প্রথমে আসা উচিত, কংগ্রেস সভাপতি-রূপে তার পরে। কিন্তু, যে-কোনো দলনিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মানতে বাধ্য, দেশের রাজনৈতিক স্বাস্থ্য, অন্তত এখন পর্যন্ত, কংগ্রেসের শক্তি আর দুর্বলতার ওপর অনেকটা নির্ভর করে। এবং সবাই জানেন, সুস্থ রাজনীতিই শাসনব্যবস্থাকে দান করতে পারে যথার্থ গণতান্ত্রিক চরিত্র। ইংরেজিতে যাকে বলে লেজিটিমেসি, যার বলে শাসনকর্তৃপক্ষ শুধু আইনের চোখে নয়, সর্বসাধারণের চোখেও ক্ষমতার ন্যায়সংগত অধিকারী বলে প্রতিভাত হন, একমাত্র সুস্থ সবল সজীব রাজনীতিই তা তুলে দিতে পারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে। কাজেই, গণতন্ত্রে সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতার হিসেব-নিকেশের মধ্যে যেমন প্রশাসনের ক্ষেত্রে, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও, তার শক্তি আর দুর্বলতার প্রশ্নটাকে অবশ্যই আনতে হবে। এ কথা যে-কোনো গণতান্ত্রিক দেশ সম্পর্কেই সত্য। ভারতে কংগ্রেস ছাড়া সত্যিকারের সর্বভারতীয় দল আর দ্বিতীয় নেই। সেইজন্যে কংগ্রেস তার রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করল কিনা, সে দায়িত্ব পালন করবার ক্ষমতা তার থাকল কিনা, সে প্রশ্নটা সকলের পক্ষেই অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার কথা স্মরণ করলেই বোঝা যায়। রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে নিজের রাজনৈতিক সমস্যার মোকাবিলা করতে শাসকদল যখন না পারে, এবং প্রশাসনিক ক্ষমতার অসংগত ব্যবহার পরিহার করবার কোনো পথ দেখতে পায় না, তখন গণতান্ত্রিক সরকার কেমনভাবে আত্মরক্ষার তাগিদে, অবিধেয় পন্থার দিকে পা বাড়ায়, ১৯৭৫-এর ২৬ জুন তারিখে ইন্দিরা গান্ধী তারই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

আজ, ২৬ জুন ১৯৮৫, সেই জরুরি অবস্থা প্রবর্তনের দশম বার্ষিক দিবস। রাজীব গান্ধীর নামে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে, তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেন, কিন্তু ইতিহাস পড়েন না। কিন্তু ইতিহাস পড়ায় যে ফাঁকি দেয়, ইতিহাসের দিদিমণির সামনে বারবার তাকে দাঁড়াতে হয়, একই শিক্ষা বারে বারে নেবার জন্যে।

কিন্তু একেবারে কোনো শিক্ষাই যে রাজীব গান্ধী ইতিহাস থেকে নেন নি, তাঁর নিজের প্রধানমন্ত্রিত্বের এই ছ

দেশে বিদেশে

শ্রী গান্ধী, মনে হয়, এমন এক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে কাজ করতে চান, দেশের বৃহৎ-জটিল, হয়তো ধূলিমলিন কিন্তু সজীব রাজনীতির প্রবেশ যেখানে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হলেও, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তিনি কি জানেন না, তাঁর জীবনের নিরাপত্তার প্রয়োজন যতই বড়ো হোক, দেশের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ আরও বেশি প্রয়োজন?

মাসের ইতিহাস তা বলে না। অন্ধ্রপ্রদেশে রামা রাও সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে একথা বলতে রাজি যদি নাও হন, মনে-মনে নিশ্চয় স্বীকার করবেন, রাজীব গান্ধী ইতিহাস থেকে কিছু শিখেছেন। কর্ণাটকে রামকৃষ্ণ হেগড়েও মানবেন, ইতিহাসের দিদিমণির বেতের ঘা হাতে পড়ার পর, কংগ্রেস—অর্থাৎ রাজীবের নেতৃত্বাধীন নতুন কংগ্রেস—এবং তাঁরই নেতৃত্বাধীন নতুন ভারত সরকার সহবত শিক্ষার প্রথম পাঠটি অন্তত গ্রহণ করেছে। রাজনীতির এই প্রথম পাঠ হল—যা তোমার নয়, যে ক্ষমতা লোকে তোমাকে দেয় নি, তার দিকে হাত বাড়িও না। আরও একটা শিক্ষা ইতিহাসের কাছে হয়তো রাজীব গ্রহণ করেছেন : জীবনের আর-পাঁচটা বড়ো-বড়ো ব্যাপারের মতো রাজনীতিতেও ধৈর্য ধরতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীর অনেক গুণ ছিল, কিন্তু ওই একটি জিনিস ছিল না। যদি কিছু পছন্দ না হল, যদি কারো সম্বন্ধে মনে একটু বিরূপ ভাব কি একটু সন্দেহ জাগল, যদি একটু মনে হল কারো বাড় বেড়েছে—তা তিনি কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীই হন, আর অকংগ্রেসিই হন—সঙ্গে-সঙ্গে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন।

অবশ্য তার কারণও ছিল। রাজীব গান্ধীর কোলে প্রধানমন্ত্রিত্ব যেমন পাকা ফলটির মতো টুপ করে খসে পড়েছিল, ইন্দিরা গান্ধীর বেলায় তা হয়নি। কিংবা, বলা উচিত, প্রধানমন্ত্রীর পদটি তিনি মোটামুটি সহজেই পেলেন বটে, কিন্তু নিঃশর্ত, অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব পেলেন না, তাঁর ক্ষমতার লড়াই শুরু হল ক্ষমতার আসনটি পাবার পর। তারপর কখনো প্রয়োজনে, কখনো-বা অপ্রয়োজনে, অভ্যাসবশত সে লড়াই তিনি চালিয়ে গেলেন আজীবন। নিজে স্বস্তি পান নি বলেই কাউকে স্বস্তি দিতে পারেন নি, না নিজের দলের কাউকে, না বিরোধী দলকে।

দেখেশুনে যা মনে হয়, রাজীব গান্ধী মানুষটাই ধীর স্বভাবের। তার ওপরে মায়ের মৃত্যুর পর তিনি দেখলেন দলে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী, আর নির্বাচনের পর দেখলেন, দেশেও তিনি তাই। শুধু তাই নয়, তাঁর বয়স কম, স্বাস্থ্য ভালো, কর্মক্ষমতা দীর্ঘকাল অটুট থাকবার সম্ভাবনা। অতএব, তাড়াহুড়োর কী প্রয়োজন? অন্তত রাজনৈতিক বিরোধী-পক্ষ সম্পর্কে ব্যস্তসমস্ত হয়ে এখনই কিছু একটা করা দরকার—দেশের অবস্থা তেমন নয়। অল্প আঁচে নিজের রসে তাঁরা নিজেরাই সিদ্ধ হতে থাকুন।

ইতিমধ্যে চলতে থাক দেশকে একবিংশ শতাব্দীর দিকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ। গত কয়েক দশকের ইতিহাস রাজীব গান্ধীকে এই একটা সত্য অবশ্যই শিখিয়েছে যে, দেশের অর্থনৈতিক যাবতীয় উদ্যোগ এবং চেষ্টাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কষে বাঁধলে তার কাছ থেকে দেশকে এগিয়ে দেবার মতো প্রাণশক্তি আশা করা ভুল। জাতির কানে মন্ত্রের মতো অনবরত 'উৎপাদন বাড়াও', 'প্রডিউস অর পেরিশ' ইত্যাদি স্লোগান জপ করলে তাতে উৎপাদন বাড়ে না, কাউকে 'কৃষিপণ্ডিত', কাউকে 'শ্রমবীর' উপাধি দিয়ে কৃতার্থ করলে, তাতেও উৎপাদন বাড়ে না। 'সমাজতান্ত্রিক মানুষ' বলে কোনো উন্নততর প্রাণীর উদ্ভব এখনও হয় নি। কৃষককে তার শ্রমের উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে। তেমনি শ্রমিককে। তেমনি ব্যবসায়ীকে, শিল্পোদ্যোগীকে দিতে হবে তার শ্রমের, তার মূলধনের, তার উদ্যোগের মূল্য।

স্টীল অর্থরিটি অব ইনডিয়া লিমিটেড (সেইল) একটি বিপুলায়তন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান—যেমন আকারে বিপুল, তেমনি লোকসানের বহরেও। সম্প্রতি জানা গেল, টাটা আয়রন অ্যানড স্টীল কোম্পানির এবং অন্যান্য বেসরকারি কোম্পানির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কাউকে-কাউকে রাজি করানোর চেষ্টা চলছে, তাঁরা যাতে সেইল-এর বোর্ডে ডিরেকটর হয়ে যোগ দেন। ভারত সরকারের ইস্পাত ও খনি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সেইল-এর কারখানাগুলোতে এখন যা দরকার তা হল 'টিসকো কালচার'। কী এই 'টিসকো কালচার' যার সাহায্যে টাটা কোম্পানি, যার বোর্ড ভারতীয়দের দিয়ে গঠিত, যার সর্বস্তরে সবাই ভারতীয়, পুরোনো যন্ত্রপাতি দিয়ে নির্ধারিত উৎপাদনক্ষমতার ওপরে আরও শতকরা দশ ভাগ করে চলেছে? অন্তত এটুকু সহজেই বোঝা যায়, 'সেইল'-কালচারের থেকে তা শত যোজন দূরে অবস্থিত। 'সেইল'-কালচারের একটা পরিণামের কথা শ্রী নটবর সিং সখেদে উল্লেখ করেছেন : 'সেইল'-এর একটা বিরাট মারকেটিং সংগঠন আছে, কিন্তু ইস্পাতব্যবহারকারীদের কী চাহিদা, সে বিষয়ে বিশেষ কোনো অনুসন্ধান তাঁরা করেন না। ফলে, 'সেইল'-এর বিভিন্ন কারখানায় যে মাল উৎপন্ন হয়, বাজারে তার বিশেষ কাটতি নেই। ফলে প্রতি বছর আমাদের ইস্পাত আমদানি করতে হচ্ছে। চলতি বছরেই ইস্পাতের আমদানি দাঁড়াবে ১৫ লক্ষ টনের মতো। শ্রী সিং আরও বলেছেন, 'সেইল'-এর অফিসে যে যাঁরা কলম পিশছেন তাঁদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি লোকের কারখানায় কাজ করা উচিত ছিল। (স্টেটসম্যান, ২৪ জুন ১৯৮৫)

নানা সমাজতান্ত্রিক দেশে এখন টিসকো-কালচারের কদর বাড়ছে। ভারতকে যদি সামনের দেড় দশকের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীর জন্যে তৈরি হয়ে উঠতে হয়, টিসকো-কালচার ছাড়া তার গতি নেই। নতুন রাজীব-সরকার প্রথম ছ মাস সে উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন। করব্যবস্থায়, আমদানি-রপ্তানি নীতিতে, শিল্পোদ্যোগ স্থাপন এবং প্রসারসংক্রান্ত নীতিতে তার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর সবই যে রাজীব গান্ধীরই প্রবর্তন, তা নয়। আমেরিকার ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে তিনি বলেছেন, এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে—আমি বুঝি বৈপ্লবিক সব পরিবর্তন সাধন করছি। আসলে তা নয়। আমি যা করছি তার ভিত্তি আগেই স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে অনেক-কিছুর সূত্রপাত আগেই হয়েছিল। আমি শুধু সেসব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কৃষিতে, শিল্পে, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে অগ্রগতি রাতারাতি সম্ভব নয়। তার জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি এবং প্রচেষ্টা দরকার। সে প্রস্তুতি এবং সে প্রচেষ্টা আগেই খানিকদূর এগিয়ে ছিল, তাই এখন রাজীব গান্ধী একবিংশ শতাব্দীর কথা বলতে পারছেন।

কিন্তু আগেকার অনেক শতাব্দীর দায় যে আমাদের চোকানো বাকি আছে, তার কী হবে? দুরপনেয় দারিদ্র্য, অপরিমেয় অশিক্ষা, সীমাহীন সামাজিক অন্যায়—এসব সমস্যা দু-চার দিনের নয়, দু-চার দিনে যাবারও নয়। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা আমরা সুদূর অতীতে কোনো দিন যদি বা পেয়েও থাকি, অনেক কাল তা ভুলে বসে আছি। আবার ঘাড় ধরে আমাদের সে শিক্ষা দেবে তারাই, যাদের আমরা এখনও মানুষ বলে গণ্য করি না। দারিদ্র্য দূর না হোক, তার উপশম হবে, শিক্ষারও বিস্তার হবে ক্রমশ। তখন দেখব, কোথায় থাকে আমাদের সনাতন ঔদ্ধত্য।

কিন্তু এত সব মোটে ছ মাসের হিসাবের মধ্যে ঠিক আসে না। দেশের অর্থনীতি যদি এগিয়ে চলতে থাকে, শিক্ষা যদি ছড়িয়ে পড়তে থাকে, আশা করা যায়—সামাজিক অন্যায় এবং অবিচারও পিছু হঠতেই থাকবে। এই ছ মাসে রাজীব-সরকার সে প্রক্রিয়ার অনুকূলেই কর্মরত, এটুকু অন্তত বোঝা যায়। পশ্চিম-ভারতে সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন এখনও কোনো প্রশ্রয় পায় নি, যদিও শ্রী গান্ধী বলেছেন, সংরক্ষণের সমগ্র প্রশ্নটা নিয়ে দেশব্যাপী একটা বোঝাপড়ার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। তেমনি আবার পানজাবে যে সনাতনপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠী দেশের একটা অতিশয় প্রগতিশীল অংশকে তিন শতাব্দী পিছিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, তাদের সম্পর্কেও তিনি দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন।

ভাষাগত, আঞ্চলিক এবং ধর্মীয় সংকীর্ণতা আমাদের অগ্রগতির পথে মস্ত বড়ো বাধা। তার থেকেই উৎপত্তি যত হানাহানির এবং বিচ্ছিন্নতার মনোভাবেরও। কোথাও-কোথাও সে মনোভাব উৎসাহ পেয়েছে, কিংবা প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহ না পেলেও অন্তত প্রশ্রয় পেয়েছে অতিশয় অদূরদর্শী রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির কাছ থেকে। সেই ভুলের মাশুল আমাদের আর কতদিন দিতে হবে, কে জানে। ভরসার কথা শুধু এইটুকুই যে, গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনার গতি-প্রকৃতি দেখে মনে হয়, এইবারে বোধ হয় সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের জোয়ারে ভাটার টান লেগেছে। দেশের পশ্চিম প্রান্তে অকালিদের এবং শিখগুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতির নেতাদের কেউ-কেউ এখনও সেই আনন্দপুর প্রস্তাব, সাত-দফা দাবি ইত্যাদির কথা বলে যাচ্ছেন বটে, তবে মনে হয় যেন গলায় ততটা জোর আর লাগছে না, আর অপেক্ষাকৃত নরমপন্থীরা, মনে হচ্ছে, উগ্রপন্থীদের ভয় আরেকটু কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাস্তবতার সঙ্গে রফা করতে রাজি হবেন। শ্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কলকাতায় বলেছেন, পানজাব-সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এখন সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। আসামেও আন্দোলনকারীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পথে পা বাড়াবার একটা ইচ্ছে ধীরে-ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে, নির্বাচনের অনুকূলে আবহাওয়া গড়ে উঠছে বলে মনে হয়।

আর, দেশের উত্তর-পূর্ব প্রত্যন্তে বিচ্ছিন্নতাবাদের চেহারাটা আলাদা। ওইসব অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব, আজকের এই দ্রুত যোগাযোগের দিনেও একটা দুরূহ মানসিক ব্যবধানের সৃষ্টি এখনও করে রেখেছে। আবার, দূরত্ব থেকে অপরিচয়, অপরিচয় থেকে অবিশ্বাস—এ যেমন সত্য, তেমনি অযাচিত সান্নিধ্য থেকে আরও গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাও সত্য। এই-সব সমস্যার উত্তরাধিকার রাজীব গান্ধীর ওপর বর্তেছে। এখনই বলবার সময় আসে নি—সমাধানের সম্ভাবনা তাঁর আমলে আরেকটু কাছে আসবে, না, আরও দূরে সরে যাবে।

সব মিলিয়ে, এই প্রথম ছ মাস সম্পর্কে বলা যায়, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাজীব গান্ধী অপ্রত্যাশিত কৃতিত্ব কিছু যদি নাও দেখাতে পেরে থাকেন, সব দিক বিবেচনা করে তাঁকে অকৃতকার্য বলাও ভুল। অন্তত দেশের নানাবিধ জটিল তথা দীর্ঘমেয়াদি সমস্যার সমাধান যে পথে সম্ভব বলে মনে হয়, তিনি সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন নি।

কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র প্রশাসনের কর্তাই নন, রাজনৈতিক নেতাও বটেন। রাজীব গান্ধী তো আবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। নিজের প্রশাসনিক দায়িত্বকে অবশ্যই তিনি সবচেয়ে ওপরে স্থান দেবেন, কিন্তু রাজনৈতিক দায়িত্বটাও তাঁকে মনে রাখতে হবে। সে বিষয়ে তিনি কতদূর অবহিত? তিনি কি মনে রেখেছেন, দেশ-শাসন শুধুমাত্র পরিচালন-কৃৎ-কৌশলের ব্যাপার নয়, বিপুল

জনসমষ্টির মধ্যে থেকে তাকে প্রাণরস আহরণ করতে হয়?

শোনা যাচ্ছে, অতিক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ একটি সহচর-মণ্ডলীর বাইরে অন্য কারো পক্ষে শ্রী গান্ধীর কাছে যাওয়াই কঠিন। আরো শোনা যাচ্ছে তাঁর সেই ঘনিষ্ঠ সহচর তথা পরামর্শ-দাতারা রাজনীতি-রহিত। তা ছাড়া, দেখাও যাচ্ছে, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীরা পর্যন্ত তাঁর দর্শনকামনায় দিনের পর দিন রাজধানীতে ধরনা দিয়ে পড়ে থাকেন, তাঁর পরে কেউ দেখা পান, কেউ পান না। অর্থাৎ যে-কোনো কারণেই হোক, শ্রী গান্ধী, মনে হয়, এমন এক পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকে কাজ করতে চান, দেশের বহুৎ-জটিল, হয়তো ধূলিমলিন কিন্তু সজীব রাজ-নীতির যেখানে প্রবেশ, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ না হলেও, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। তিনি কি জানেন না, তাঁর জীবনে নিরাপত্তার প্রয়োজন যতই বড়ো হোক, দেশের রাজ-নৈতিক জীবনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ আরও বেশি প্রয়োজন?

সেই প্রয়োজনেই তাঁকে যেমন নিজের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, তেমনি আবার নিজের দলের সংগঠন-কেও জাতীয় জীবনে নতুন শক্তিতে, নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কেননা, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক শক্তিই দেশ-শাসনের যথার্থ অধিকার দান করে।

আফগানিস্তানে অমানবিকতা

এই জুলাই-এ কাবুলে বাবরাক কার-মাল সরকার ইচ্ছে থাকলেও একটি স্মরণীয় ঘটনার ষষ্ঠ বার্ষিকী উৎসব পালন করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। ১৯৭৯-এর জুলাই মাসে ৪০০-বিমানবাহিত সোভিয়েত সৈনিকের একটি ব্যাটালিয়ন কাবুলের ৩০ কিলোমিটার দূরে বাগরাম-নামক স্থানে অবতরণ করে। আফগানিস্তানের মাটিতে সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সেই প্রথম পদার্পণ।

তারপর প্রায় ছ বছর কেটে গেল। ১৯৭৯-এর সেই স্মরণীয় জুলাইয়ের পরে, বছর না ঘুরতে, ডিসেম্বর মাসের ২৬ তারিখে ৩০০০০ সোভিয়েত সৈন্য আফগানিস্তানে প্রবেশ করল। মস্কো বলল, আমরা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছি। কে নিমন্ত্রণের চিঠি পাঠিয়েছিল? প্রেসিডেন্ট আমিন যদি পাঠিয়ে থাকেন (তিনিই তো গৃহকর্তা), প্রতিদানে টেলেন মৃত্যু। আমন্ত্রিত বাহিনী প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ আক্রমণ করল, প্রেসিডেন্টকে হত্যা করল। বাবরাক কারমাল সোভিয়েত উজবেকিস্তান থেকে বেতারে ঘোষণা করলেন, পারচাম গোষ্ঠীর নেতৃত্বে অভ্যু-খান সফল। তার মানে তিনি প্রেসি-ডেন্ট। কেমন জনপ্রিয় সে সরকার? সে বিষয়ে ভোটদান অব্যাহত আছে। পদযুগলের সাহায্যে। পৃথিবীর বৃহত্তম আশ্রয়প্রার্থীর সমাবেশ এখন পাকিস্তানে।

রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি ১৯৮৪-এর অগস্ট মাসে অস্ট্রীয় আইনতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ফেলিক্স এরমাকোরাকে নিয়োগ করেন আফ-গানিস্তানে মানবাধিকার সংক্রান্ত পরি-স্থিতি অনুধাবন করে সে বিষয়ে রিপোর্ট দেবার জন্যে। সে রিপোর্টের একটি বিবরণ ১৪ জনের ইনডিয়ান একসপ্রেসে প্রকাশিত হয়েছে। উল্লেখ করা উচিত, ৪৩ সদস্যের মানবাধিকার কমিশন ১৯৮৪-র ১৫ই মার্চ ভোট দিয়ে একজন স্পেশাল র‍্যাপোর্টের অর্থাৎ বিশেষ সংযোগস্থাপনকারী নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। প্রাশিয়া প্রস্তাবটির আলোচনা মুল-তুবি রাখতে চেয়েছিল, এবং ভারত রাশিয়াকে সমর্থন করে। মুলতুবির প্রস্তাব নাকচ হবার পর, যখন মূল প্রস্তাবটির ওপর ভোট নেওয়া হয়, তখনও ভারতে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে, সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। তারপর এই বছর মার্চ মাসে যখন মান-বাধিকার কমিশন রিপোর্টটি নিয়ে বিবেচনা করে, তখন আবার ভারত তার বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বস্তুত সোভিয়েত গোষ্ঠীর বাইরে একমাত্র ভারতই আগা-গোড়া মানবাধিকার কমিশনের এই চেষ্টাকে বাধা দিয়ে এসেছে।

রিপোর্টটির বক্তব্য খানিকটা জানার পর এখন আমাদের পক্ষে বোঝা আরও সহজ, সোভিয়েত রাশিয়া কেন স্পেশাল র‍্যাপোর্টের নিয়োগের বিরোধিতা করে-ছিল। ভারত কেন বিরোধিতা করে-ছিল, তার বিশদ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

নিযুক্ত হয়ে অধ্যাপক এরমাকোরা আফগান সরকারের কাছে দুটি পত্র পাঠান। প্রথমটিতে তিনি আফগানি-স্তানে যাবার অনুমতি চান, দ্বিতীয়-টিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভি-যোগের উত্তর দেন। কোনো চিঠিরই জবাব আসে নি। গত ডিসেম্বরে তিনি পাকিস্তানে যান এবং বহু ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তা ছাড়া, তিনি চারটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। যেসব আফগান তাদের গ্রামে বোমাবর্ষণে আহত, অথবা আশ্রয়ের সন্ধানে পাকিস্তানে আসবার পথে আহত হয়েছিলেন, হাসপাতালগুলি বিশেষভাবে তাঁদেরই জন্যে নির্দিষ্ট। (আফগানিস্তানের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৫৫ লক্ষের এক-চতুর্থাংশের বেশি এখন বিদেশে শরণার্থী।) মনে রাখা দরকার, আফগানিস্তানে আন্ত-র্জাতিক রেড ক্রসের প্রবেশ নিষেধ। যাই হোক, তাঁর অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অধ্যাপক এরমাকোরা যে রিপোর্ট দিয়ে-ছেন তাতে দেখা যায়ঃ

(১) ১৯৮২ থেকে আফগান শিশু-দের জন্যে একটি চিত্তাকর্ষক উপহার হেলিকপটার থেকে বিতরণ করা হচ্ছে —নানারকমের খেলনার জীবজন্তু, কলম ইত্যাদি। কোনো শিশু সেগুলি স্পর্শ করা মাত্র বিস্ফোরণ ঘটবে। নয় থেকে পনেরো বছর বয়সের সে-রকম কিছু শিশু এবং বালকবালিকাকে অধ্যাপক এরমাকোরা হাসপাতালে দেখেছেন। বোমার ঘায়ে হাত-পা যাদের উড়ে গেছে।

(২) গ্রামের নিরীহ অধিবাসীদের ওপর বোমাবর্ষণের ঘটনা তো আছেই, যাঁরা পালাতে চেষ্টা করেন তাঁদের ওপরও বোমার, বিমানের আক্রমণের ঘটনার কথা তিনি শুনেছেন। এমন কি জেনেশুনে হাসপাতালের ওপরও বোমা ফেলা হয়।

(৩) বিষাক্ত গ্যাস এবং অন্যান্য রাসা-য়নিক দ্রব্যের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

এ কথা সবাই জানে, শরণার্থীদের সাক্ষ্যের ওপর নির্বিচারে নির্ভর করা উচিত নয়। কিন্তু অধ্যাপক এরমা-কোরা নানা সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে দেখে যতদূর সম্ভব যাচাই করে নিয়েছেন, এবং সোভিয়েত গোষ্ঠীর এবং ভারতের বিরোধিতা সত্ত্বেও রাষ্ট্র-সংঘের মানবাধিকার কমিশন অধ্যাপক এরমাকোরার রিপোর্ট গ্রহণ করেছে।

২৬.৬.১৯৮৫

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

নাটক

কিত্তনখোলা ও ঢাকা থিয়েটার

নান্দীকার আয়োজিত
জাতীয় নাট্যমেলা

নান্দীকারের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'জাতীয় নাট্যমেলা ৮৫' অনুষ্ঠিত হল অ্যাকাডেমি মঞ্চে ১-৫ জুনে। এবারেও তাঁরা তিনজন গুণী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জানান। এঁরা হলেন হাবিব তনবির, তাপস সেন, বি. ভি. করন্থ। এবারের নাটক ছিল—

(১) **দেবাংশী**। প্রযোজনা—তিতীর্ষু, বালুরঘাট। নাটক—অভিজিৎ সেন। নির্দেশনা—হরিমাধব মুখোপাধ্যায়।

(২) **চক্রব্যূহ**। প্রযোজনা—কোরাস রেপার্টোরি থিয়েটার, মণিপুর, নাটক ও নির্দেশনা—রতন থিয়াম।

(৩) **পশুগায়ত্রী**। প্রযোজনা— দিশা নাট্য সংস্থা, রাজস্থান। নাটক—কেভলস্ নারায়ণ পানিকর (মালা-য়ালম্)। অনুবাদ—দীপক যোশী। নির্দেশনা—ভানু ভারতী।

(৪) **কমলব্যূহ**। প্রযোজনা—লোক-কলামঞ্চ, মধ্যপ্রদেশ। (মহাভারতের 'জয়দ্রথপর্ব' অবলম্বনে 'কমলব্যূহ') কথক—পুন্নারাম নিষাদ।

(৫) **কিত্তনখোলা**। প্রযোজনা—ঢাকা থিয়েটার, বাংলাদেশ। নাটক—সেলিম আল দীন। নির্দেশনা—নাসিরউদ্দিন ইউসুফ।

কিত্তনখোলার দুটি শো হয়। বিক্রয়-লব্ধ অর্থ দেওয়া হয় বাংলাদেশের ঝঞ্ঝা-দুর্গতদের ত্রাণ ভাণ্ডারে।

'জাতীয় নাট্যমেলায় একমাত্র 'আন্ত-র্জাতিক' দল ঢাকা থিয়েটার। আবার তাদের অভিনয় বাঙলা ভাষায়। এবার 'কিত্তনখোলাকেই আমরা বেছে নিলাম আমাদের প্রধান আলোচ্য হিসেবে।]

১৯৮০-র মে মাসে 'বহুরূপী' পত্রিকার 'বাংলাদেশ থিয়েটার সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। তাতে তিনটি প্রবন্ধে 'ঢাকা থিয়ে-টার' সম্পর্কে উল্লেখ আর আলোচনা ছিল। ওই সংখ্যাটির সম্পাদক ঢাকার নাট্যদল সম্পর্কে যে তথ্য সংকলন করে-ছিলেন, তাতে একটি সুভেনির থেকে উৎকলিত হয়েছিল 'ঢাকা থিয়েটা'রের লক্ষ্যঃ "আমরা মৌলিক নাট্যচর্চায় অঙ্গীকারবদ্ধ।" রমেন্দু মজুমদার তাঁর 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নাট্য-চর্চা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "তরুণতর নাট্যকারদের মধ্যে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় সেলিম আল দীন।...যদি তিনি আবেগ-উচ্ছ্বাসকে দমন করে তাঁর রচনায় সংযম ও গভীরতা আনতে পারেন, তবে সম্ভাবনার উজ্জ্বল দ্বার তাঁর সামনে অবারিত।" মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর তাঁর 'ঢাকার নাটক' প্রবন্ধে শতাধিক-রজনী-অতিক্রান্ত 'শকুন্তলা' নাটকের উল্লেখ করেন; নাট্যকার সেলিম আল দীন এবং নির্দেশক নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কথাও বলেন।

ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা—২১ জুলাই ১৯৭৩। মোট প্রযোজনা—তেরোটি নাটক। এর মধ্যে আছে বাংলা-দেশের 'প্রথম রাস্তা নাটক'—চর কাঁক-ড়ার ডকুমেন্টারি। আছে ১৫৮-রজনী-অভিনীত 'শকুন্তলা'। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গো-পাধ্যায়ের কাছে ছিল। সেটি আমার এবং এখানকার অন্য অনেকের পড়ার সুযোগ ঘটে। এতে শকুন্তলা-কাহিনীর নতুন ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা ছিল। পরে এঁরা গ্রাম থিয়েটার সংগঠন করেন। এই স্তরের প্রযোজনা—সফরুলমুলুক বদি-উজ্জামাল (১৯৮১), কিত্তনখোলা

(১৯৮১), বাসন (১৯৮২), কেরামতমঙ্গল (১৯৮৫)।

দেখা যাচ্ছে, কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রাণবন্ত দলটি 'মৌলিক নাটক' থেকে 'রাস্তার নাটক' ও 'গ্রাম থিয়েটার সংগঠনে' পৌঁছেছেন। গ্রাম থিয়েটার সংগঠনের কাজ—গ্রামে গিয়ে সেখানকার সমস্যা নিয়ে সেই গ্রামের অধিবাসীদের দিয়েই অভিনয় করানো। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'গ্রাস-রুট' থিয়েটার করার চেষ্টা চলছে। এ চেষ্টা হয়তো অনেকটা তারই মতো। উন্নত দেশ আমেরিকাতেও এ চেষ্টা আছে, উন্নয়নশীল ভারত আর বাংলাদেশেও আছে।

ঢাকা থিয়েটার ছাড়াও বাংলাদেশে 'আরণ্যক' ও 'অরিন্দম' (চট্টগ্রাম) নাট্যদলও এইজাতীয় নাট্যকর্ম করে থাকে। জিয়া হায়দার ঠিকই বলেছেন, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশে "স্থানীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সমস্যা সম্বলিত নাট্যের চেয়ে শুদ্ধ নাট্য ও নাট্যের অভিনব ফর্ম নির্মাণের প্রতি আগ্রহ।" আর বাংলাদেশে (এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে) "সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, বৈষম্য ও শোষণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে জনগণকে জীবনসচেতন করাই উদ্দেশ্য।" (জিজ্ঞাসা, বাংলাদেশ বিশেষ সংখ্যা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯১)।

ঢাকা থিয়েটারের সবথেকে ফলপ্রদ ঘটনা—নাট্যকার সেলিম আল দীন আর নির্দেশক নাসিরউদ্দিন ইউসুফের সংযোগ। দুজনে দুজনের সৃষ্টিশীলতার সহায়ক। এঁরা কী রকম নাটক করতে চান, কী এঁদের আদর্শ, তা সেলিম আল দীনের দুটি লেখায় পাচ্ছিঃ (১) কিত্তনখোলা ও ঢাকা থিয়েটার, জিজ্ঞাসা, মাঘ-চৈত্র ১৩৯১। (২) কিত্তনখোলা নাটকের ভূমিকা-প্রবন্ধ, কিত্তনখোলা নাটক ও প্রযোজনা প্রসঙ্গ। দুটি লেখা অবশ্য অনেকটাই এক, প্রথমটি চিঠি, তাই একটু ব্যক্তিগত। দ্বিতীয়টি তা নয়।

তাঁরা চান—দেশজ রীতি। বিদেশী নাট্যরীতি বর্জন তাঁদের কাম্য। কয়েকটা উদ্ধৃতি দিইঃ

"ঘটনা নয়, বর্ণনামুখীন উপস্থাপনা।"

"বাংলা নাটকে বর্ণনাধর্মিতা ও সংলাপমুখিতা পরস্পরের পরিপূরক। অথচ ইউরোপীয় সংজ্ঞায় উৎকৃষ্ট নাটকে এটা হবে নিতান্ত দূষণীয়। এ জন্যই বোধহয় বাংলা নাটকে ঘটনার তাড়া থাকে না, নৃত্য ও সংগীতের ব্যাপক প্রয়োগে নাটক হয়ে উঠে মঞ্চের অলংকার।"

"নাটকের আঙ্গিকচেতনা সংকীর্ণ হলে এ মাধ্যমে মানুষ ভাস্কর্যের আনন্দ আর সঙ্গীতের দ্যোতনা পাবে না।"

"বাংলা নাটকের অগোছালো অচিন্তিত নির্মাণ বিষয়ে ঢাকা থিয়েটার '৭২ সাল থেকে সচেতন।"

"ফ্ল্যাট চরিত্র, সরাসরি সমাজসংস্কারকের ভূমিকা, আমাদের অধিকাংশ বাংলা নাটককে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।"

এই তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনায় দরকার নেই। সরাসরি নাটকে চলে যাই।

কিত্তনখোলার মেলায় বহু মানুষ এসেছে। যাত্রার দল, লাউয়া সম্প্রদায়, বায়োস্কোপওয়ালা এসেছে। এসেছে সোনাই, যার ঠাকুরদা তাঁত বুনত, বাপ জমি চষত, আর সে নিঃস্ব দিনমজুর—জমি হারিয়ে। আছে মেলা কমিটির মেমবার ইদু কনট্রাকটর—সে এখন নয়া জোতদার। বিচিত্র সব মানুষের ভিড়। সেলিম বলছেন, "এই বিষয়টি অনেকাংশে মহাকাব্যের। ......মহাকাব্যের স্বভাজ শিল্প ও আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যকে নাটকের ভেতরে স্থাপনের দুর্মর বাসনা ছিল।...(ক) এ নাটকে নবরসের প্রয়োগ করেছি। (খ) এপিক সিমিলিও প্রয়োগ করেছি অনেকবার। (গ) স্বর্গমর্ত্যের বিষয়ও পরোক্ষভাবে আছে এ নাটকে।" আছে সর্গবিভাজন।

এইসব বাইরের লক্ষণে কি মহাকাব্য হয়? মহাকাব্যিক বিস্তার বরং অসুবিধাই ঘটিয়েছে। সেলিম বলেছেন, তিনি সব সময় মনে রেখেছেন "অজস্রতা যেন বৈশিষ্ট্যহীন না হয়।" শুধু বৈশিষ্ট্যহীন না হলেই চলবে? তাদের সমগ্র নাট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে হবে না? অজস্রতা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে নি কি অনেক ক্ষেত্রে? অজস্রতা একটা সুর-ঐক্যে বা হারমনিতে বিধৃত না হলে তার শিল্পমূল্য দাঁড়ায় কি? অজস্রতা তখন জীবনসত্যকে প্রকাশ না করে আড়াল করে যে।

বহু চরিত্র। হয়তো ষাট জন। 'মেলার দু-তিনটি দিন মাত্র সময়। এই সীমিত সময়ের মধ্যে অনেকের পূর্ব ইতিহাস শোনানো হয়। এর প্রায় সবটুকুই বর্ণনামূলক, ঘটনামূলক নয়। সেলিম দেশজ বর্ণনামূলক রীতির সমর্থক, সে কথা জানিয়েছেন। কিন্তু এত বর্ণনা তো দর্শককে ক্লান্ত করে। নাট্যকার-নির্দেশক সেটাও জানেন। ক্লান্তিকে কাটাবার চেষ্টায় বর্ণনামূলক অংশের অভিনয় বেশি আবেগ দিয়ে করা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে যতটা আবেগ স্বাভাবিক লাগে, অপ্রত্যক্ষ বর্ণনায় তা ফাঁপানো লাগে, কৃত্রিম মনে হয়। মধ্যযুগের পালা বা পাঁচালী চলত অনেক দিন ধরে (আট দিন, পনেরো দিন, এক মাস ইত্যাদি)। সেখানে দীর্ঘ বর্ণনা খাপ খেয়ে যেত, বা অপরিহার্য ছিল। এখনকার পালা বড়ো জোর তিন ঘণ্টার, তাহলে বর্ণনা তো আনুপাতিক হারেও কমে আসবার কথা।

ঘটনাকে অবশ্য এঁরা শেষ পর্যন্ত পরিহার করতেও পারেন নি। শেষ দিকে অনেকগুলি জোরালো ঘটনার ক্লাইম্যাকস গোড়ার ঘটনাহীনতার ক্ষতিপূরণ করে নিয়েছে। ছায়ারঞ্জনের 'আমি মোচলমান হবো' ঘোষণা (যা নাট্যকারের মতে "আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুগভীর সাম্প্রদায়িক বেদনা বহন করে"।) বনশ্রীবালার আত্মহত্যা, রবিদাসের যাত্রা (সিরাজের ভূমিকা) না করার সিদ্ধান্ত, সোনাইর ডালিমনের প্রেমলাভ ও বিচ্ছেদ, ইদুর হত্যা—একটুখানি সময়ের মধ্যে এত বড়ো-বড়ো ঘটনা হুড়মুড় করে ঘটে গেছে, এবং অনেক সময় সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করে গেছে। যেমন, বনশ্রীবালার মৃত্যু কি অবশ্যম্ভাবী? ডালিমন-সোনাইর প্রেম বড়োই আকস্মিক। প্রবল শক্তিমান ইদুকে খুন করা কি অতই সহজ?

নাট্যকার জানিয়েছেন, "সেমিটিক মূল্যবোধের বদলে আমরা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষা।" 'মূল্যবোধে'র বদলে 'ভাষা' হয় না। হয়তো এখানে 'ভাষা' কথাটা মূল্যবোধের সমার্থক হিসেবেই নাট্যকার ব্যবহার করেছেন। প্রশ্ন থেকে যায়, এই নবীন মূল্যবোধটা কী? তাঁর দুটি লেখাতেই দেশজ নাটকের ফর্ম নিয়েই তিনি মূলত মাথা ঘামিয়েছেন, নবীন মূল্যবোধটা স্পষ্ট করেন নি কোথাও। হয়তো শোষণের কথা আছে, কিন্তু নবীন কোনো দৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যা নেই, নেই কোনো প্রতিকার-প্রয়াস।

নাটক শুধু 'দেশজ' নয়, কালজ-ও। এই কাল-কে বোঝার দিকে নাট্যকার-নির্দেশকের আগ্রহ কম। সোনাইর ঠাকুরদা ছিল তাঁতি, বাপ চাষি, সে নিঃস্ব দিন-মজুর, পরে খুনি, আরো পরে বাউন্ডুলে বেদে। এই 'রূপান্তর'কে নাট্যকার জাতকের রূপান্তর আর জীনপরীদের রূপান্তরের সঙ্গে এক করে দেখেছেন। কিন্তু এই দেখা ঠিক দেখা নয়। এ 'রূপান্তর' মোটেই অলৌকিক নয়। লৌকিক, কালজ। সময়ের মধ্যে, সমাজের মধ্যে বিশ্লেষণী দৃষ্টি চালান নি তিনি। এইখানে একটা বিপদ আছে। আমাদের দেশজ নাট-গান-আখ্যান মধ্যযুগসৃষ্ট, তাই তার দৃষ্টিভঙ্গি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক, সংকীর্ণ অর্থে ধর্মীয়। একালের নাট্যকারকে পুরাতনের মাটিতে শিকড় খুঁজতে হয়, সঙ্গে-সঙ্গে মূল্যবোধকে আধুনিক-কালোপযোগী করে নিতে হয়। এইখানে বিশেষ সচেতনতা দরকার।

দেশজ বা অন্যবিধ যে ফর্মই হোক না কেন, লক্ষ্য কিন্তু দর্শক। দর্শকের কাছে ভালোভাবে পৌঁছতে হবে। দর্শক কালবদ্ধ, আজকের দর্শক সে। তার একটা দিক গড়ে দিয়েছে দেশজ ঐতিহ্য, আর একটা দিক নিয়ত গড়ছে আজকের কাল, আজকের সমাজ। এই দর্শকের সঙ্গে কমিউনিকেশনের প্রসঙ্গটা যেন এঁদের চিন্তায় কিছুটা অবহেলিত।

বনশ্রীর মনসা-সাদৃশ্য-কল্পনা—এটা কি জনগ্রাহ্য হবে? নাট্যকার মনসাকে দেখেছেন অসহায়া আত্মীয়বান্ধবহীনা অন্ত্যজ-পূজিতা এক ক্রোধ-দীপ্তা নারী হিসেবে। লোকমনে কিন্তু মনসা স্বার্থপর, পূজাপ্রচারে অনমনীয়, অপরকে অধীন করার চেষ্টায় হিংস্র, স্বাধীনচিত্ত মানুষের বুকে দংশনরত। এর সঙ্গে কোথায় বনশ্রীর সাদৃশ্য? মীথ বা পুরাকথার ব্যবহারে নাট্যকার আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার প্রাধান্য দিয়েছেন। 'শকুন্তলা'র নব-ব্যাখ্যাতেও এ জিনিস আছে।

বনশ্রীর ভূমিকায় সুবর্ণা মুস্তাফার আর ডালিমনের ভূমিকায় শিমূল ইউসুফের অভিনয় নাট্যকারের ভালো লেগেছে, তিনি জানিয়েছেন। কিন্তু পাপের বাজার থেকে যে উঠে এসেছে, রবিদাস ও ছায়ারঞ্জনের মধ্যে যার ভাঙচুর অবস্থা, যে মদ খায়, যে ইদুর সামনে রাতে একা নাচে, যে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে, এমন মেয়ের জ্বালা কি প্রকাশ পেয়েছে সুবর্ণা মুস্তাফার অভিনয়ে? দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে—না। এতে আমি অভিনেত্রীর দোষ ততটা দেখি না, যতটা দায়ী মনে করি, নাট্যকার-নির্দেশকদের। ডালিমন-সোনাইর প্রেম যথেষ্ট দানা বাঁধে নি, অথচ বিদায়দৃশ্যে অত্যন্ত বেদনাময় হতে হয় ডালিমনকে। ফলে ফাঁপানো লাগে ডালিমনের কথা আর বেদনা। এখানেও দায়িত্ব নাট্যকার আর নির্দেশকের। ইদু, ছায়ারঞ্জন, রবিদাস, শামছল—এই বিড়ম্বনায় পড়ে নি এবং ভালো উতরেছে।

গানের সংখ্যা অতিরিক্ত। দেশজ রীতিতে গানের স্থান আছে। কিন্তু নাটকের প্রয়োজন, দর্শকের সহনশীলতা—এসবও ভাববার আছে।

নাট্যকার কলকাতায় 'ককেশিয়ান চক সার্কল'-এর বাঙলা রূপান্তর দেখেছেন। সেখানে 'অজস্রবার আলো জ্বালানো-নেভানোর ফলে নাটক দেখার পুরো আনন্দটাই মুক্তিকালুণ্ঠিত হয়।' তখন তিনি বলেছিলেন, "এতবার আলো যদি নিভলো, তাহলে তা আদৌ জ্বালাবারই বা কি দরকার ছিল!"

ঠিকই, দেশজ রীতিতে আলোজ্বলা-নেভার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু 'কিত্তনখোলা'য় আলো বহুবার জ্বলেছে নিবেছে। বনশ্রীর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা ও ইদুর খুনের সঙ্গে-সঙ্গে 'দপ করে আলো নিভে' যাওয়ার নির্দেশ নাট্যকার তাঁর বইতে স্বয়ং দিয়েছেন।

সেট করেছেন জামিল আহমেদ। দিল্লির ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামার প্রাক্তন ছাত্র এই তরুণ শিল্পীর কাজ আমরা দেখেছি 'হননমেরু', 'নুরুলদীনের সারাজীবন', 'হাজার চুরাশির মা' এবং 'কিত্তনখোলা'য়। তাঁর শিল্পবোধ ভালো। কিন্তু একটু ভারি আর একটু দামি কাজের দিকে তাঁর ঝোঁক। গ্রুপ থিয়েটারের পক্ষে দুটোই

অসুবিধার—খরচে, বহনে। 'কিত্তনখোলা'য় বাংলাদেশের গ্রাম-পটভূমির পরিকল্পনাটি ভালো। কিন্তু হল-এর অনুপাতে বড়ো। স্টেজ থ্রাস্ট-এর ফলে হল-এর মধ্যে ঝুঁকে আসে। আনুপাতিক ভারসাম্য তাতে আরো ক্ষুণ্ণ হয়। দেশজ রীতিতে তো সেট থাকে না। খোলা মঞ্চ তো বেশি উপযোগী হত এই মেলা-পটভূমির নাটকে।

নাট্যকার বলেছেন, নির্দেশক 'অংশতঃ মায়ারহোল্ডের কনস্ট্রাক্টিভিজম্ রীতির প্রয়োগ করেছেন। ......সোনাই চরিত্রে মিশ্রণ করেছেন গ্রোটৌভ্স্কির ফিজিক্যাল থিয়েটারের অভিনয়রীতি।" তবে যে তাঁরা পাশ্চাত্য রীতি পরিহার করবেন ঘোষণা করেছিলেন! তবে দেখা যাচ্ছে, দেশজ রীতি বিষয়েও গোঁড়া হওয়ার কোনো অর্থ নেই। বিদেশী রীতিতে আমাদের আপত্তি নেই—যদি দেশজ রীতির সঙ্গে তা ঠিক মেশে। তত্ত্বের ব্যাপারে গোঁড়া না হওয়াই ভালো। তত্ত্ব যত উচ্চ করেই গড়া যাক, সৃষ্টি সর্বদাই তাকে ছাপিয়ে ওঠে।

কিত্তনখোলার সাফল্য সম্পর্কে কি নাট্যকারের আগেই সংশয় ছিল? তিনি লিখেছেন, "কিত্তনখোলায় আমরা ব্যর্থ হতে পারি, কিন্তু আমাদের সততায় যেন আপনি সন্দেহ পোষণ না করেন।" না, ঢাকা থিয়েটারের সততায় আমরা বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করি না। দেশজ রীতির প্রয়োগ-প্রয়াস নিঃসন্দেহ গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দনযোগ্য। সেইজন্যেই এত কথা বলা। দ্বিতীয়ত, এ নাটকের ভাষা মাটির প্রাণরসে সঞ্জীবিত। নাটকীয়তা কম, বিস্তার বেশি, গীতিধর্ম বেশি। সহজ, স্বাভাবিক, আবেগময়। তৃতীয়ত, ষাট জন লোককে নির্দেশক যেভাবে পরিচালনা করেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য।

কিত্তনখোলা ভালো সমালোচনা ছাড়া—একমাত্র তরুণ কবি শফিক মাহমুদের আলোচনা ছাড়া। অন্য সব আলোচনাই নাট্যকারের মনে হয়েছে 'বাণিজ্যিক'। "আমার দীর্ঘ-দিবস-রজনী-ব্যাপী নিভৃত রক্তক্ষরণের সাক্ষী যে নাটক তা, যদি বিনোদনমূলক প্রতিবেদনের বিষয় হয়, তাহলে ক্রুদ্ধ দাঁতে ঠোঁট কেটে আরও একবার রক্তে ক্ষরিত হই।" বলেছেন ক্ষুব্ধ ব্যথিত নাট্যকার।

আমরা নাট্যকারকে আশ্বস্ত করছি, আমাদের আলোচনা 'বিনোদনমূলক প্রতিবেদন' নয়। সত্য অনুভূতি। শিকড়ের সন্ধানে যারা হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের প্রচেষ্টা সঠিক দিকে, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে কোনো তত্ত্বকে গোঁড়ামির দিকে বাড়ানো ঠিক নয়। তত্ত্বকে বাড়ানো উচিত সৃষ্টির দিকে। ঢাকা থিয়েটারের হয়তো কিছু-কিঞ্চিৎ গোঁড়ামি আছে, মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গি এখনো সুস্পষ্ট নয়, তবু তার যাত্রা সঠিক পথেই। তার পদক্ষেপ সর্বদা সুশৃঙ্খল নয়, কিন্তু তার গতি আছে, প্রাণ আছে, আন্তরিকতা আছে, সেই গুণেই সে অনেক দূর এগোবে, এই প্রতিশ্রুতি আছে তার প্রাণবন্ত পদক্ষেপে।

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

বাংলাদেশে নাট্য-আন্দোলনের সামগ্রিক পর্যালোচনা থাকবে আগামী সংখ্যায় 'ঢাকার চিঠি'-তে।

সিনেমা

পার : একফালি জীবন

গৌতম ঘোষের 'পার' ছবি দর্শকসাধারণের সমাদর পেয়েছে। ব্যবসায়িক ছকে বাঁধা ছবি যখন দর্শকের আনুকূল্য পায় (যেমন সাম্প্রতিক কয়েকটি বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে ঘটেছে) তখন সিনেমার সঙ্গে যাঁদের রুটি-রুজি জড়িত, তাঁরা স্বভাবতই উৎসাহিত হন। কিন্তু সত্যিকারের সিনেমাপ্রেমীরা উৎফুল্ল হন তখনই, যখন শিল্পধর্মী ভিন্ন স্বাদের ছবি দর্শক-প্রশংসা পায়। 'পার' সেই কাজ করতে পেরেছে এবং এর ফলে মনে হয় যাঁরা ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তাঁরা নতুন করে উৎসাহ পাবেন।

গৌতম তাঁর ছবি করার আদিপর্ব থেকেই পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্পর্কে সচেতন। শুধু সচেতনই নন, সামাজিক অসংগতি আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদে মুখর। একেবারে গোড়ার দিকের তথ্যচিত্র কংসাবতী প্রকল্প এবং খাদ্যসমস্যা নিয়ে তার বহু-আলোচিত 'হাঙরি অটাম'—এই দুটি ছবিতেই সাধারণ মানুষের বঞ্চনা আর বেদনার প্রতিফলন ঘটেছে। তেলেঙ্গানা সংগ্রামের পটভূমিকায় তৈরি গৌতমের প্রথম কাহিনীচিত্র 'মাভূমি'তে এই বঞ্চিত মানুষেরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। 'দখল' ছবিতেও গৌতমের চরিত্ররা সমস্ত লাঞ্ছনা পেরিয়ে জীবনের শেকড় খুঁজে চলে। 'পার'-ও সেইসব মানুষেরই আলেখ্য, যাদের অমানুষিক সহনশক্তি এক ঐশী মহিমায় উত্তীর্ণ।

সমরেশ বসুর ছোটোগল্প 'পাড়ি'-কে ভেঙে গৌতম তৈরি করেছেন তাঁর ছবি। মূল গল্পের যে মুখ্য ঘটনা, এক দেহাতি দম্পতির জীবিকার খোঁজে কলকাতা আর আশেপাশের শিল্পাঞ্চলে ঘোরাফেরা, অবশেষে রোজগারের অন্য কোনো পথ না খুঁজে পেয়ে শুয়োরের পালকে গঙ্গা পার করিয়ে মহাজনের হাতে দিয়ে পয়সা পাওয়া—এই আখ্যানটুকু এসেছে ছবির দ্বিতীয় অংশে। তার আগে ছবির দুই কেন্দ্র-চরিত্র নওরঙ্গিয়া (নাসিরুদ্দিন শাহ) আর তার বউ রামা (শাবানা আজমি) আমাদের কাছে পরিচিত হয় তাদের নিজেদের পরিবেশে মুঙ্গের জেলার এক হরিজন গ্রামে। কিন্তু সেখানেও তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন। পরদা জুড়ে প্রায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এখানে-ওখানে দু-চারটি আলোর ফুলকি। হরিজনবস্তির ঘুপচি ঘরে কেরোসিনের অভাবে অমাবস্যার অন্ধকার। হঠাৎ চারদিক সচকিত হয়ে ওঠে মোটরসাইকেলের আওয়াজে আর বীভৎস চিৎকারে হানা দেয় আততায়ীর দল পেট্রল, বোমা, বন্দুক আর লাঠি নিয়ে। বস্তির অন্ধকার আলোকিত হয়ে ওঠে ধ্বংস আর আর হত্যার রোশনাই-এ। মুহূর্তে যেন খবরের কাগজের হেডলাইনগুলো জীবন্ত হয়ে ওঠে চোখের সামনে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় হরিজন-নিধনের যেসব বিবরণ আমরা প্রায়ই পাই, হঠাৎ যা শুনলে মনে হয় যে আমরা যেন বর্বর যুগে বাস করছি, সেই বীভৎস ট্র্যাজেডিরই কয়েকটি দৃশ্য উন্মোচিত হয় আমাদের কাছে। এই উন্মত্ত তান্ডবের কারণ কিন্তু সনাতন। মজুরির লড়াই। খেতমজুররা সরকারি হারে পারিশ্রমিক চায়, জমিদার তা দেবে না। খেতমজুরদের বাঁচার লড়াই-এ মদত দেন এক আদর্শবাদী স্কুল মাস্টার (অনিল চ্যাটার্জি)। কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই চরিত্রের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু চরিত্রচিত্রণ কিছুটা ফরমুলাগন্ধী। যাই হোক, সেই খুনের বদলা নিতে হরিজনপল্লীর কিছু লোক খুন করে জমিদারের ভাইকে—যে ছিল সমস্ত কুচক্রের মেঘনাদ। তারই প্রতিশোধ নিতে ধেয়ে আসে জমিদারের হানাদার বাহিনী। এই-সমস্ত কাহিনীটিই টুকরো-টুকরো ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে বর্ণিত। এ ধরনের ছবিতে বিচ্ছিন্ন ফ্ল্যাশব্যাকের প্রয়োগ ছবির চরিত্রহানি করে বলে আমার বিশ্বাস। এসব ছবির গঠন রৈখিক এবং সরল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহলেই ছবির আবেদন সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারে।

এই ভয়াবহ ঘটনার পর নওরঙ্গিয়া আর রামা গ্রাম ছেড়ে পালায়। বহু ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে ওরা এসে পৌঁছয় কলকাতায়। সেখান থেকে নৈহাটির চটকলে। জীবিকার খোঁজে হয়রান এই দম্পতির দিন গুজরান হয় অর্ধাশনে, অনশনে। যন্ত্রণা চরমে ওঠে গর্ভবতী রামার। যখন দুজনে প্রায় ধুঁকছে তখন নওরঙ্গিয়ার কাছে প্রস্তাব আসে শুয়োরের পালকে গঙ্গা পার করাবার। নদীপারাপারের এই অধ্যায় তাদের জীবনে যেন এক সাঙ্কেতিক দ্যোতনা নিয়ে আসে। এই পাড়ি যেন তাদের নতুন জীবনে উত্তরণেরই এক প্রতীক। তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিচালক নীরবই থেকেছেন, কারণ কোনো সুনির্দিষ্ট পরিণতি তাঁরও জানা নেই।

আগেই বলেছি, ছবিটির মধ্যে দুটি গল্প আছে। গোলমালটা এখানেই যে দুটো গল্প কখনও এক হয়ে যায় নি। নওরঙ্গিয়ার গ্রামের গল্প ছাড়াই আমরা নৈহাটির গল্পকে ধরতে পারি। আবার গ্রামের গল্পটিও একটা স্বতন্ত্র অংশ হিসেবে দর্শকের কাছে আসতে পারে। গ্রামের গল্পে নাটকের উপাদান বেশি, ঘটনার ঘোড়দৌড়ের শেষে প্রথাসিদ্ধ ক্লাইম্যাক্সে যার শেষ। সমস্ত রকম মালমশলা দিয়ে সাজানো একটা নাটক। বাস্তবের ওপরটা আঁচড়ানো আছে, কিন্তু অন্তরঙ্গ অন্বেষণ প্রায় অনুপস্থিত। গৌতম অবশ্য সেই অভাব পুষিয়ে দিয়েছেন নৈহাটির গল্পে। মেকি নাটকীয়তার আশ্রয় না নিয়ে জীবনের এক নির্মোহ, নিষ্ঠুর রূপ তুলে ধরেছেন গৌতম তাঁর ক্যামেরায়। গৌতম যদি আর-একটু সাহসী হয়ে নৈহাটির গল্পকেই ছবির কাঠামো করে কাজ করতে পারতেন, তবে আমরা বোধহয় একটা পূর্ণাঙ্গ শিল্পকৃতি উপহার পেতাম।

গঠনের এই গলতি সত্ত্বেও 'পার' ছবির একটা বড়ো সম্পদ দৃশ্যগত কারুকাজ। গৌতমের ক্যামেরা (তিনি নিজেই এই ছবির চিত্রগ্রাহক) দৃশ্যগুলোকে এক আলাদা ব্যঞ্জনা দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে কয়েকটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে সেগুলোর কথা একটু বলি। জমিদারের ভাইকে হত্যার দৃশ্যে সন্ধ্যার আলো-আঁধারির প্রয়োগ (ঈষৎ নীল রঙের মিশ্রণে দৃশ্যটি আরও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে) আসন্ন ভয়াবহতার আভাস এনেছে। নৈহাটির গল্পে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার সময় প্রশস্ত গঙ্গার শটগুলো খুবই কার্যকর। গৌতমের ক্যামেরা এখানে বাস্তবের গভীরে ঢুকে জীবনসত্য খুঁড়ে নিয়ে আসে। কিন্তু ক্যামেরার কাজে গৌতম যতটা দক্ষ, সংগীতের ব্যবহারে তিনি ততটাই অমনোযোগী। যত্রতত্র তিনি আবহসংগীত যোগ করেছেন, ছবির মেজাজের সঙ্গে কোনো সংগতি না রেখেই।

এ ছবির অভিনয়ে শিল্পীরা প্রায় সামগ্রিক কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন। তবুও আলাদাভাবে কয়েকজনের কথা বলতে হয়। নাসিরুদ্দিন আর শাবানা এ ছবিতে তাঁদের অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন। সেটা না পেলেও তাঁদের অভিনয় নিশ্চয়ই প্রশংসিত হত। অভাবনীয় আন্তরিকতা আর পরিশ্রম দিয়ে তাঁরা চরিত্রকে বোঝবার চেষ্টা

করেছেন এবং চরিত্রের ব্যাখ্যায় বুদ্ধি এবং হৃদয় দুটোকেই কাজে লাগিয়েছেন। ছোটোখাটো চরিত্রের মধ্যে জমিদারের ভাই-এর ভূমিকায় মোহন 'আগাসের অভিনয় বহুকাল মনে থাকবে। সিনেমার মার্কামারা ঘূর্ণিতলোচন ভিলেন-চরিত্রের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম মোহনের ভদ্রবেশী শয়তানের চেহারা, যে ঠাণ্ডা মাথায় গণহত্যার মতলব আঁটতে পারে, শোষণের সূক্ষ্মতম পদ্ধতি যার নখদর্পণে।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

প্রসঙ্গ ভাষা

প্রথম-শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করবেন না

পশ্চিম বাঙলা সরকারের সংবাদ আর সংস্কৃতি বিভাগ এ বছর কবিপক্ষে বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন কলকাতায়। ছ দিনের অনুষ্ঠান : ১৪ থেকে ১৯ মে। ১৪ই সন্ধ্যায় উদ্বোধন, তার পরের পাঁচ দিন রোজ ছ ঘণ্টা ধরে (১১-২, ৩-৬) প্রবন্ধপাঠ আর আলোচনা—এই ছিল কার্যক্রম। আলোচ্য বিষয় ছিল : লিপিসংস্কার, বানানসংস্কার, অভিধান তথা কোষগ্রন্থ প্রণয়ন, পরিভাষা সংকলন, আর সরকারি কাযকর্মে বাঙলা ভাষার ব্যবহার।

এই আলোচনাচক্রের বিশেষ আবশ্যকতা ছিল। আর রাজ্য-সরকারেরই উদ্যোগী হয়ে এই আলোচনাচক্রের আয়োজন করার জরুরি প্রয়োজন ছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলায় এখন তিনটি ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

প্রথমত, এ রাজ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তথা শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে।

দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক শিক্ষার বইগুলি বেশ ভেবেচিন্তে, সঠিক পদ্ধতি অনুসারে প্রস্তুত হওয়ার দরুন, আর প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় ভাষার বোঝাটা নামিয়ে দেওয়ার দরুন, গ্রাম(পশ্চিম)-বাঙলায় মাঝপথে-পড়া-ছেড়ে-দেওয়া বিদ্যার্থীর সংখ্যা একটু-একটু করে কমছে। অর্থাৎ, লিখিত বাঙলার তথা মাতৃভাষার অধ্যয়ন ধীরে-ধীরে সমাজের অনেক নীচ পর্যন্ত নামছে ; আগের তুলনায় অনেক বেশি বাঙালি শিশু আগ্রহ নিয়ে বাঙলা পড়তে আর লিখতে শিখছে। সমাজের নিম্নশায়ী বর্গ লিখিত শব্দের অস্ত্র করায়ত্ত করছে। এই শুভ ঘটনার সুফল আমরা দশ-পনেরো বছর পরেই বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারব।

তৃতীয়ত, সরকারই প্রাথমিক বইগুলি লেখাচ্ছেন আর ছাপছেন, এবং ছাপছেন বর্ণযোজনার তিনটি পৃথক রীতিতে—হ্যানডসেটে, লাইনোটাইপে, ফোটোটাইপসেটিঙে।

এই তৃতীয় ঘটনাটি এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে চলেছে।

বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বই লিখছেন। তাঁদের অনেকেরই বাঙলা বানানের ধারণা তথা জ্ঞান অস্বচ্ছ। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন বইয়ের মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করছেন। তাঁদেরও বেশিরভাগেরই বানানের ধারণা উলটোপালটা। প্রাথমিকশিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তারাও সব বইয়ে বানানের একরূপতা রক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন না। স্পষ্টই বোঝা যায়, পাণ্ডুলিপি প্রেসে যাওয়ার আগে যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় না—অন্তত বানানের দিক দিয়ে।

এর ফল? প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর সব কটি বই যদি একসঙ্গে নিয়ে একটু খুঁটিয়ে পড়া যায়, বানানের উৎকট সব অসংগতি চোখে পড়ে। একই বইয়ে একই শব্দের বা একই-জাতীয় শব্দের রকম-রকম বানান দেখা যায়।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা নিয়ম বুঝে সঠিক বানান শেখে না— চোখের অভ্যাসে শেখে, শব্দের একই রূপ দেখতে-দেখতে (এবং লিখতে-লিখতে) শেখে। সরকারের ছাপানো বইয়ে একই শব্দের ভিন্ন-ভিন্ন বর্ণরূপ ছেলেমেয়েদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে, সঠিক বানান শেখার ভিতটাকেই টলিয়ে দিচ্ছে।

তলিয়ে দেখলে একই বইয়ে কাল-কালো, ভাল-ভালো, এস-করো (বর্তমান অনুজ্ঞায়) চোখে পড়বে। কোনো বইয়ের লেখককে বলতে শোনা গেছে : ভাষা বা ইতিহাস বা ভূগোলের বইয়ে বর্তমান অনুজ্ঞায় ধাতুর উত্তর ও-বিভক্তিযোগ অনুমোদন করা গেলেও গণিতের বইয়ে যোগ করা হবে অ-বিভক্তি। সেই লেখকের নির্দেশই মুদ্রণতত্ত্বাবধায়কেরা শিরোধার্য করেছেন। গণিতের বইয়ে পাই পড়-লেখ-কর, অন্য বইয়ে পড়ো-লেখো-করো।

বিভ্রাট আরও জটিল হয়েছে এক-এক বই এক-এক মুদ্রণরীতিতে ছাপা হওয়ার দরুন।

ধরা যাক লন্ঠন শব্দটি। এটি সংস্কৃত শব্দ নয়, তাতে ণ লাগার কথা নয়। জোড়া ন+ট লাইনোটাইপে আনা যায়, কিন্তু হ্যানডসেটে আনা যায় না। আবার, ফোটোটাইপসেটিঙে জোড়া ন+ট ণ+ট দুই-ই আনা যায়। ফলে, শিক্ষার্থীরা এক বইয়ে দেখছে লণ্ঠন, আরেক বইয়ে লন্ঠন।

প্রাথমিক শিক্ষার এইসব বই ছেলেমেয়েদের চোখ একই শব্দের একই বানানে অভ্যস্ত হওয়ার পথে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোকশিক্ষার প্রধান প্রবন্ধক এখন যখন স্বয়ং সরকার, তখন তার—

অন্তত তার প্রাথমিকশিক্ষাবিভাগের— বানানের সুচিন্তিত নিয়মাবলী থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রাথমিক স্তরের সব বইয়েই একই বানানরীতি অনুসরণ করা উচিত।

শুধু প্রাথমিক স্তরেই বা কেন? মাধ্যমিকশিক্ষাপর্যৎ, উচ্চমাধ্যমিকশিক্ষা-সংসদেরও সেই রীতির অনুগামী হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদেরও সেই রীতি নির্বিকল্পভাবে গ্রহণ এবং কার্যকর করা কর্তব্য। এই অতি-জরুরি কাজটি যদি রাজ্য-সরকার অল্প সময়ে সেরে উঠতে পারেন, দশ বছর পরে দেখা যাবে—ছাত্রছাত্রীরা অন্তত অ-তৎসম শব্দের বানানে একরূপতা রক্ষা করতে শিখে গেছে : কখনো ভাল, কখনো ভালো লিখছে না ; এ-পাতায় করল, ও-পাতায় নোয়ালো লিখছে না ; সকালে বলো, বিকালে কর লিখছে না।

দ্বিতীয় জরুরি কথা : **আপাতত** প্রাথমিক শিক্ষার কোনো বইই হ্যানডসেটে ছাপা উচিত নয়—সব বইই ফোটোটাইপসেটিঙে ছাপা হওয়া উচিত। তাতে বর্ণরূপের সমতা- বা অভিন্নতা-রক্ষা অনেক সহজ হয়ে উঠবে। বঙ্গলিপির অনেক জটিলতারও সরলীকরণ এই পিটিএস মুদ্রণরীতিতে বহুলপরিমাণে সম্ভব হতে পারে : ব্যঞ্জনে স্বরধ্বনিচিহ্ন (=কার) যোগ করতে গিয়ে বর্ণ যেসব বিদঘুটে চেহারা নেয়, বা যুক্তব্যঞ্জনের যেসব হতবুদ্ধিকর রূপ দেখা দেয়, এই রীতিতে সেসব অনেকটা সুবোধ্য সুদর্শন রূপ পেতে পারে।

হ্যানডসেট-রীতি আপাতত পরিহার করার কারণ : যেভাবে লিপিসংস্কারের কথা ভাবা হচ্ছে তাতে বহু টাইপের নতুন ছাঁচ বানাতে হবে। ধরা যাক, রেফ-চিহ্নের অবস্থান। প্রস্তাব করা হচ্ছে : রেফচিহ্ন চলে আসুক অব্যবহিত-পরবর্তী ব্যঞ্জনের বাঁদিকে। যুক্তিযুক্ত কথা। এখনই তা করতে হলে 'করন' বা আলগা রেফ বসাতে হবে। দুটি কারণে তা না করাই উচিত। এক : 'করন' রেফ আর পরের ব্যঞ্জনের মধ্যে একটা সরু ফাঁক দেখা দেবে—দেখতে কুচ্ছিত লাগবে। দুই : লম্বা-টানের ছাপায় ওই রেফ ভেঙে যেতে পারে।

তাই রেফ-জোড়া বর্ণের অনেক নতুন-নতুন ছাঁচ গড়তে হবে। শেয়ালদার সরস্বতী প্রেস এখন সরকারের পরিচালনায় চলছে। ওখানে টাইপ-ঢালাইয়ের ভালো কারখানা আছে। সরকার উদ্যোগী হলে এই কাজটা ওখানে সুন্দরভাবেই সারা হতে পারে। লিপিসংস্কারের প্রস্তাবগুলিকে ফলপ্রসূ করে তোলার মোটামুটি সহজ এই পথটা সরকারের সামনে খোলা আছে।

২

স্বীকার না করে উপায় নেই, আলোচনাচক্রের এই আয়োজন সময়োচিতই হয়েছে। কিন্তু একটু যেন তাড়াহুড়োর ছাপ দেখা গেছে। একটু বেশি সময় নিয়ে যথোচিত সযত্ন প্রস্তুতি থাকলে ফল হত আরও বেশি।

বাঙলাভাষী মানুষের সবচেয়ে বড়ো শরিকরা এখন বাংলাদেশী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষাকে কিভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, এ নিয়ে তাঁদের মাথাব্যথা আর চিন্তাভাবনা সম্ভবত আমাদের চেয়ে বেশি। এই আলোচনাচক্রে ও-দেশের শিক্ষাজীবী তথা বিদ্যাজীবীদের একান্ত অনুপস্থিতি চোখে না পড়ে পারে নি। অন্তত লিপিসংস্কার আর বানানসংস্কারের কোনো সিদ্ধান্ত ওঁদের বাদ দিয়ে হতেই পারে না। ও-বাঙলায় এইসব বিষয় নিয়ে কিছু-কিছু চিন্তাভাবনা হয়েছে, প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। আয়োজকরা যদি সেগুলির একটি সারমর্ম সংকলন করে প্রচার করতেন, উপকার হত।

এই আলোচনায় লিপিসংস্কার আর বানানসংস্কার নিয়েই দু-চার কথা বলা হল। আর এই দুই সংস্কারকর্মে সরকারের যে গুরুতর ভূমিকা আছে, সে কথা বলবার চেষ্টা করা হল। আগামী সংখ্যায় আরও বিস্তৃত আলোচনা পত্রস্থ করা হবে।

অশোক ঘোষ

চিত্রকলা

ভারতের ধাতুশিল্পের ঐতিহ্য

প্রাক্‌বৈদিক মোহেনজোদড়ো সভ্যতায় নৃত্যরত নারীর একটি ব্রোনজমূর্তি পাওয়া গিয়েছিল—এর থেকেই ঐতিহাসিকদের এই অনুমানে সায় দিতে আমাদের দ্বিধা জাগে না যে, ভারতবর্ষের ধাতুশিল্প বেশ প্রবীণ-বয়স্ক। ধ্রুপদী যুগেও সোনা-রুপো-তামা-ব্রোনজ ইত্যাদি ধাতুকে পুড়িয়ে-পিটিয়ে-গলিয়ে নানারকম আকার দিতেন কারিগররা।

আসল কথা, ভারতীয় সভ্যতার প্রস্তরযুগে ভূমির গর্ভ থেকে নিষ্কাশিত ধাতুকে কাজে লাগানোর যে বুদ্ধি এবং প্রয়াস দেখা দিয়েছিল তা ঝিমিয়ে পড়ে নি কোনোদিনও ; উপরন্তু সব সময়ই তা আরও বেশি পুষ্ট এবং স্ফীত হবার স্বপ্নই দেখেছে।

বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' এবং 'কাদম্বরী' আখ্যানে লিখছেন—গুপ্তসাম্রাজ্যের শ্রমজীবীরা নাকি নেশার ঘোরে ধাতুর রাসনকোসন বানাত। ধাতব শিল্পের প্রচার এবং প্রসার কিভাবে সম্ভবপর হয়েছিল তা খুঁজতে গেলে এমন বহু ঐতিহাসিক খতিয়ান নজরে পড়বে।

সুলতানি যুগের নবাবরা শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে ধাতুশিল্পের বহু ছোটোখাটো কারখানা নির্মাণ করেছিলেন, কারিগরদের প্রণোদিতও করেছিলেন নানাভাবে। খানদানি নবাবদের এদেশে আগমনের পরিপ্রেক্ষিতেই পারস্য কিংবা মধ্যএশিয়ার সঙ্গে ভারতবর্ষের কিছু সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বিনিময়ের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে। এই সময়েই শিল্পীরা ধর্মীয় পুজার্চনা বা ঘরগৃহস্থালির নৈমিত্তিক ব্যবহার্য বানাতে শুরু করে পারসিক ধাঁচে বা মধ্য-এশিয়ার নানান শৈলীতে। এ ব্যাপারে সুলতানদের পক্ষ থেকে তারা নিবিড়ভাবে প্রাণিত হত।

মুঘল বাদশাহ আকবর শিল্পসংস্কৃতিকে বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন—ইতিহাস বলে একথা। সুতরাং তাঁর আমলে ধাতুশিল্প যে নতুন কদর পাবে—তা তো সংগত কারণেই সত্য। শোনা যায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নাকি সেরা ধাতুশিল্পীদের সাড়া দিতে হয়েছিল সম্রাট আকবরের আহ্বানে। ক্রমশ সম্রাট আকবরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষণায় দেশীয় তথা আঞ্চলিক নির্মাণরীতি বৈদেশিক প্রভাবের সংযোজনায় এক নবতর রূপ এবং আঙ্গিক লাভ করল। এর পর বছরের পর বছর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে আর শিল্পীদের নিত্যনবায়মান রূপকল্পনার যোজনায় ক্রমসমৃদ্ধির পথে এগোতে লাগল এই ধাতুশিল্প।

পানজাবে তৈরি তামা বা পিতলের পানপাত্র, জলপাত্র বা বাতিদানের নকশাগুলি ছিল সূক্ষ্ম আর ধারালো। কাশ্মীরের শিল্পীরা তামা বা পিতলের উপর পাতলা টিনের কারুকাজে রুপোলি ফুল তুলত। বেনারস বা মোরাদাবাদি সরা বা পানবাটা যে-কোনো শিল্পপ্রাণ মানুষের কাছেই যথেষ্ট আকর্ষণীয়। মধ্যপ্রদেশের ফুলদানি বা মোমদানি এখনও বহন করে চলেছে তার অক্ষয় ঐতিহ্যের ধারা। যদিও ইদানীং পরিশ্রম- এবং অর্থ-সংকোচের উদ্দেশ্যে স্লেচ্ছ স্টীলকে আমরা সংসারে প্রবেশাধিকার দিতে বাধ্য হয়েছি, তথাপি এখনও বাঙলার বহু বনেদি-অভিজাত গৃহস্থ পরিবারে সাবেকি তামা-পিতল, রুপো বা খাগড়াই কাঁসার বাসনকোসনের গুরুভার আর অসম্ভব দ্যুতি বাঙলার একদা শিল্পোজ্জ্বল অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করে কর্ণাটকী শিল্পীরা ধাতুপাত্রে পৌরাণিক দেবমূর্তি খোদাই করে অলংকরণ করত। পর্যটকরা এর অনুপুঙ্খতার তারিফ করছেন যুগ যুগ ধরে। বহু শতাব্দী আগে সম্ভবত যবন অভিযানের সমকালে দামাস্কাস থেকে আমদানি করা হয়েছিল 'বিদ্রি' কারুকাজ। কিংবা ভারতীয় শিল্পীরা কিছু-কিছু তালিম নিয়েছিলেন যবনদের কাছে—এমন অনুমানও খুব ভ্রান্ত হয়তো নয়।

সে যাই হোক না কেন, উত্তরকালে হায়দ্রাবাদি আর মোরাদাবাদি ধাতুশিল্পীরা এই 'বিদ্রি' কারুকর্মে বিশেষ পারংগমতা দেখালেন। এর বিশেষত্ব হল কুচকুচে কালো অকসিডাইজড ধাতুর পাতের ওপর রুপোলি ফুললতাপাতা, পশুপাখি বা তনুদেহ নরনারীর মূর্তির উদ্‌ভাসন ঘটানো।

'সরোজ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পরিশ্রমে তিলে-তিলে সঞ্চয়-করা ধাতুশিল্পের একটি মূল্যবান সংগ্রহ নিয়ে বিড়লা অ্যাকাডেমিতে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। তদানীন্তন বিশুদ্ধ নান্দনিক চেতনার ছাপ লগ্ন হয়েছিল প্রতিটি নমুনায়। নিত্যদিনের প্রয়োজনের টুকরো সামগ্রীকেও তারা তুচ্ছ গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিতে চাইত, সৌন্দর্য আর রসবোধের তাগিদে। এবং বলাই বাহুল্য, তৎকালীন প্রশাসনের সহায়তা এবং অনুরক্তি লাভেও বঞ্চিত হয় নি সেকালের শিল্পীরা।

তবে শিল্পদ্রব্যগুলির সংরক্ষণপ্রথায় বোধহয় কিছুপরিমাণ ঔদাসীন্য অবহেলা আছে। কারণ সেগুলির জেল্লা ক্রমশ কমে আসছে, ফলে ধুলো-পড়া, চটা-উঠে-যাওয়া পাত্রগুলিকে দেখতেদেখতে মাঝে-মাঝে অবসাদ আবিষ্ট করে চোখকে। উপরন্তু, দ্রব্যগুলির উৎপত্তি বা বিবর্তনের ইতিহাস জানার কোনো সুযোগও ছিল না। কেবল বস্তুটির নাম, প্রাপ্তিস্থান—এরকম মাত্র দুএকটি অপর্যাপ্ত পরিচয় উল্লেখমাত্রেই সমস্ত পর্যবসিত। অবশ্য আমাদের মতো সন্ধিৎসু ডুবুরিদের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিড়লা মিউজিয়ম কর্তৃপক্ষ—একটি ঐতিহাসিক মানচিত্রের মুদ্রিত লিপি উপহার দিয়ে।—এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

বর্ণালী দাস

পাঠকের দৃষ্টিতে

'প্রগতি এবং দারিদ্র্য'—লেখকের মন্তব্য

চতুরঙ্গ-র মে ও জুন সংখ্যাতে আমার এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রবন্ধটির উপরে কয়েকজন পাঠকের মন্তব্য পড়ে উপকৃত হয়েছি। এজাতীয় আলোচনাতে দুটো দিক থাকে—একটা তথ্যের, এবং অন্যটি সমস্যা-সমাধানের। তথ্য নিয়ে মতভেদ হবার কথা নয়, প্রশ্ন ওঠে অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে। সমস্যা সমাধানের আলোচনাতে অবশ্য বিভিন্ন মত থাকতে পারে—এর মধ্যে কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল, এ প্রশ্নের উত্তর সন্দেহাতীতভাবে দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

আমার প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতে প্রগতির সঙ্গে দারিদ্র্যের সহাবস্থানের একটি তথ্যভিত্তিক চিত্র তুলে ধরা। এই চিত্র তিন ভাগে আঁকা যেতে পারে। প্রথম, পরিকল্পিত উন্নয়নের আগের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা ; দ্বিতীয়, গত পঁয়ত্রিশ বছরে আমরা যেসব লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করেছিলাম, তার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা ; এবং তৃতীয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আর্থিক অবস্থার সঙ্গে ভারতের বর্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনা। প্রথম দুটি তুলনার জন্য পরিসংখ্যান আমাদের সরকারি প্রতিবেদন থেকেই নিতে হয়। তাতে অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু যা পাওয়া যায় তাও খুব কম নয়। তৃতীয় তুলনাটির জন্য নির্ভর করতে হয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক-প্রকাশিত বার্ষিক রিপোর্টের উপরে। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বব্যাঙ্ক ১২৬টি দেশের আর্থিক পরিস্থিতির বিশদ তুলনীয় পরিসংখ্যান দিচ্ছেন। এর মধ্যে সমাজতন্ত্রী দেশগুলিও আছে, কিন্তু তারা তাদের জাতীয় আয় বা আয়বণ্টনের পরিসংখ্যান দেয় না। অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় চীনের 'ইনসেনটিভ-কাম-পেনালটি'-র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু জনসংখ্যার বিভিন্ন শতাংশ অনুসারে আয়বণ্টন এসব দেশে কী রকম বিশ্বব্যাঙ্ক তার কোনো তথ্য পান নি। তবু, যেটুকু জানতে পারা যায় তাতে মনে হয় যে, সমাজতন্ত্রী দেশে নিম্নতম আয় আর উচ্চতম আয়ের মধ্যে ফারাক কমেছে। এই ফারাক সুইডেন এবং অন্য কয়েকটি দেশেও খুব কম।

পুষ্কর গুপ্ত যা লিখেছেন তা অনেকটা আমার প্রবন্ধের পরিপূরক। আমার প্রবন্ধটি লেখা হয়েছিল গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে। কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হয় ১৬ মার্চ। নতুন আমদানি-রপ্তানি নীতি প্রকাশিত হয়েছে ১২ এপ্রিল। আমার প্রবন্ধটি এপ্রিলের শেষে লেখা হলে নতুন পরিপ্রেক্ষিতের বিবেচনা সম্ভব হত। অন্য কয়েকজন পাঠকের প্রধান বক্তব্য যে মূল প্রশ্নটি আমি এড়িয়ে গিয়েছি—'গোপন রোগ গোপন রাখার মতো'। আসলে রোগটা মোটেই গোপন নয়, সাদা চোখেই ধরা পড়ে। এটাকে যাঁরা চেপে রাখেন বা উহ্য রাখেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই বামপন্থী হিসাবে প্রখ্যাত। একথা স্বীকার করতে আমার বাধবে না যে উৎপাদন-কাঠামো এবং শ্রেণী-স্বার্থের সংঘাতের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারলে উন্নয়নের সমস্যা সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবেন কারা? যাঁরা পরিবর্তনের প্রয়োজন সম্বন্ধে সোচ্চার তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ধনতন্ত্রের সমস্ত সুবিধা অসংকোচে ভোগ করেন, পাঁচতারা হোটেলের তাপনিয়ন্ত্রিত ভোজনকক্ষে বসে দারিদ্র্য সম্বন্ধে সেমিনার করেন। কাজের কাজ কিছু হয় না, কিংবা আরম্ভ হলেও কিছুদূর গিয়ে থেমে যায়। এঁদের মধ্যে যাঁরা শাসনযন্ত্রের উপরে আংশিক অধিকার পান তাঁদের কার্যধারাও গতানুগতিক পন্থাকে অতিক্রম করে বেশিদূর যায় না।

তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর দেশব্যাপী মৌলিক পরিবর্তনের আশু সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহলে আমাদের কর্তব্য কী? পরিবর্তনের অপেক্ষায় চুপ করে বসে থাকতে পারি ; পরিবর্তন দ্রুত রূপায়িত করবার চেষ্টা করতে পারি ; যতদিন পরিবর্তন না আসছে ততদিন বর্তমান কাঠামোর মধ্যে যতটা সম্ভব উন্নয়নের এবং অসাম্য দূরীকরণের চেষ্টা করতে পারি। এই তৃতীয় পথটা আপোসের পথ, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এর বিকল্প এখনো দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী সরকার এটা বুঝেই বেসরকারি ধনপতিদের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। এইসব বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এখন সমাজতান্ত্রিক দেশেও অনুপ্রবেশ করেছে—সরকারের সহায়তায়ই। মৌলিক সমস্যার উপলব্ধি নিতান্তই সহজ, কিন্তু সমাধানের বাস্তব এবং অনতিবিলম্বে কার্যকর পন্থা খুঁজে বার করা অত্যন্ত কঠিন। এই কঠিন কাজ যদি আমাদের তরুণ সমাজ হাতে তুলে নেন, মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা বারবার আবৃত্তি না করে যদি কাজে নেমে পড়েন, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান হবে। সে শুভদিন আমার জীবনকালে দেখে যেতে পারলে সুখী হব।

২২.৬.১৯৮৫ **ভবতোষ দত্ত**

প্রসঙ্গ : ভারতীয় নেশন এবং সংবিধানের কাঠামো

১

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ভারত কখনো একটি 'নেশন' ছিল না। ইংরেজের কাছ থেকেই ভাবটা পাওয়া গিয়েছিল। তাদের বন্ধন থেকে মুক্তির যে সংগ্রাম আমরা করেছি তা একজাতি-একপ্রাণ-একতার শপথ নিয়েই। নইলে আমরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে একটুও এগোতে পারতাম না। শেষ পর্যন্ত বিদেশী শাসকের ভেদনীতিতেই হোক, কিংবা আমাদের মধ্যেকার বিরোধেই হোক, ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করেছি। আবার তার একাংশ পাকিস্তান হল দু-টুকরো—জন্ম নিল বাংলাদেশ। ভারত ইউনিয়ন নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে কিন্তু বিভিন্ন আঞ্চলিক বা পৃথক সত্তার দাবিদাওয়া প্রায় শুরু থেকেই উঠছিল। প্রথমে এল ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ পুনর্গঠনের দাবি। ইংরেজ আপন অর্থনৈতিক তথা প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রদেশ গঠন করেছিল। পরে তারা তাতেও পরিবর্তন এনেছিল। বিধানচন্দ্র রায় পরবর্তী কালে বঙ্গবিহার সংযুক্তিকরণের যে চেষ্টা করেছিলেন, তা সফল হয় নি। সেই সময় তুমুল বিক্ষোভ আর বিতর্কের মধ্যে আমরা বুঝেছিলাম রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই উপলব্ধি করেছিলেন—আমরা এক-নেশন নই। প্রদেশ পুনর্গঠনের প্রশ্নে সেটা আরো প্রকট হল। বোমবাই ভেঙে মহারাষ্ট্র আর গুজরাত, পানজাব থেকে বের হল হরিয়ানা। আসাম তো বহুধা-বিভক্ত। কত রাজ্য ওখানে—মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল। নতুন রাজ্য-রূপে দেখলাম হিমাচলপ্রদেশ। ভারতের বাইরে থেকে এল গোয়া, পণ্ডিচেরি আর সিকিম।

কিন্তু তাতে সব সমস্যা মেটে নি। নতুনরূপে আঞ্চলিকতার প্রসার, স্বতন্ত্র সত্তার দাবি সোচ্চার। পানজাবে শিখদের খলিস্তান দাবি, আসামে তথাকথিত 'বিদেশী'-চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বহিষ্কারের দাবি, মহারাষ্ট্রে শিবসেনার আবির্ভাব, বিহারে ঝাড়খণ্ডের আন্দোলন—একই কথা বলে। অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু দেশম এখন তত উচ্চকণ্ঠ নয়, তেমনি তামিলনাড়ুতে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম। পশ্চিমবঙ্গ আর ত্রিপুরায় 'আমরা বাঙ্গালী' দল দুর্বল হলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ-নীতির চেহারা তো ভুক্তভোগী মাত্রেরই জানা। আর জাতপাতের বিচার এবং তৎসংক্রান্ত চাকরি, ব্যাবসা, সম্পত্তি নিয়ে হানাহানি, তার দরুন লোকক্ষয় আর সম্পদবিনষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে এক ভয়াবহ ভারতের চিত্রই কি ফুটে ওঠে না?

তাই মনে হয়, এই একজাতিত্ব সম্পূর্ণ আরোপিত—স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে তার আর প্রয়োজন নেই। বরং বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিচার করে কনফেডারাল রাষ্ট্রই আমাদের প্রকৃত উন্নতি আর বিকাশের সহায়ক হবে। রাজ্যে-রাজ্যে বিবাদজনিত ক্ষয়ক্ষতি হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে সীমিত ক্ষমতা—যার প্রধান হবে দেশরক্ষা, মুদ্রা-ব্যবস্থা, যোগাযোগ, রেল বিমান আর জাহাজ, ভারি শিল্প প্রভৃতি। চাকরির ক্ষেত্রে সুষম হার বলবৎ করতে হবে, মাতৃভাষার বিকাশের পূর্ণ সুযোগ থাকবে। দেখা হবে সংখ্যালঘুর স্বার্থ। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নির্ণয় করে সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নেশন গড়তে স্মৃতি যেমন চাই, তেমনি দরকার বিস্মৃতিও—বিস্মৃতি অতীতের বিরোধ-বিচ্ছেদের। তা আমাদের হচ্ছে কই? ভাষা, জাতি, ভৌগোলিক পরিবেশ, বৈষয়িক স্বার্থ—কোনো-কিছুর বন্ধনই আমাদের এক করছে না। ভাষার ক্ষেত্রে হিন্দির প্রচলন বাধ্যতামূলক করবার প্রয়াস সফল হয় নি—বরং বিরোধ আর বিক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। ভারতের নানা অঞ্চলে কান পেতে শুনলে বিচ্ছিন্নতাবাদের সুরই শুনতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো স্থানের অধিবাসীরা তাদের নিজ রাজ্যের বাইরে ভারতেরই কোথাও যাওয়াকে বলে 'ইনডিয়ায় যাওয়া', এটা অনেকের জানা। কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঢুকতেই প্রকাণ্ড হোর্ডিঙও দেখা যায়—'ইন্দো-কাশ্মীর প্রজেকট'। খোদ সরকারি প্রচেষ্টারই এই বহিরাবরণ!

তাই কেউ যদি বলেন—এই নেশনের ভড়ঙ বাদ দিয়ে যুক্তরাজ্য-গোছের কিছু গঠন করলেই সবার মঙ্গল—দেশটারও, তাহলে বোধ হয় তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত হবে না।

দিলীপনারায়ণ দে
৪৬/১০, বেচারাম চ্যাটুজ্যে রোড,
বেহালা, কলকাতা-৩৪

প্রসঙ্গ : মৃণাল সেনের প্রবন্ধ 'সাহিত্য, সিনেমা, সময়' (এপ্রিল ১৯৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।)

২

সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্কের বিষয়টা মৃণাল সেন আবার নূতন করে তুলেছেন দেখে আশ্চর্য হলাম। আরো আশ্চর্য হলাম পড়ে যে "এই প্রশ্ন, সংশয় বা বিরোধেরও কোনো নিষ্পত্তি সম্ভব নয়।" কী আজব অদ্ভুত কথা। নিষ্পত্তি তো সেই কবে হয়ে গিয়েছে। নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। তাঁর দেওয়া মীমাংসার পরও

কোনো সংশয় বাকি থাকতে পারে নাকি? আজ পর্যন্ত কত বুদ্ধিজীবীর লেখায় পড়লাম, এ বিষয়ে আলোচনার কোনো অবকাশই নেই, শেষ কথা বলে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। বিষয়টা নূতন করে তোলার একমাত্র কারণ মনে হয় মৃণাল-বাবুর এই আক্ষেপ যে "আমার ক্ষেত্রেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে।...তবে, তাই নিয়ে তেমন আলোড়ন কখনোই হয় নি, ওঠে নি।" আর যখন কেউ দেখায় নি তখন তিনি নিজেই বিস্তৃতভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তিনি প্রেমচন্দ-এর একটি অতিপ্রসিদ্ধ গল্পকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র করতে গিয়ে গল্পটির আগাপাশতলা বদলে দিয়ে, খোলনলচে পালটে দিয়ে, মূল কাহিনীটি পড়ে আজ অবধি যে-কোনো পাঠক যা বুঝে এসেছেন তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থ আরোপ করে তাঁর চিত্রনাট্যটি সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর নিজেরই ভাষায়, "কাহিনীর শুরু যেখান থেকে তার অনেক আগে থেকেই আমরা চিত্রনাট্য শুরু করলাম। কাহিনীর শেষ যেভাবে হয়েছে আমাদের চিত্রনাট্যের শেষ সেইভাবে এল না।... এমন-কি, কাহিনীতে যার ছিটেফোঁটা আভাসও নেই এরকম একাধিক ঘটনা উপস্থাপিত করলাম চিত্রনাট্যে।" এইভাবে তিনি কাহিনীকে পুনর্গঠন করে নিয়েছেন—'পুনর্গঠন' কথাটা তাঁর নিজেরই।

এই যে 'পুনর্গঠন' করার নামে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক-দের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যকর্মকে আমূল বিকৃত করা, তার সপক্ষে কী যুক্তি দেওয়া হয়েছে? না, সিনেমা একটি স্বতন্ত্র শিল্পমাধ্যম। সাহিত্য যেমন একটি শিল্পমাধ্যম, তাকে যেমন তার নিজস্ব কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়, তেমনি চলচ্চিত্রেরও আছে নিজস্ব এক ধর্ম, তারও আছে কিছু নিজস্ব রীতি। মৃণাল সেন এই কথাটি বলেছেন "চলচ্চিত্র-নামক শিল্প-মাধ্যমের প্রতি আনুগত্য" এই গম্ভীর বাণীর দ্বারা। কিন্তু এই বাণী তো আমরা সত্যজিৎ রায়ের মুখে কুড়ি বছর আগেই শুনেছি এবং দেশসুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল "সাধু, সাধু। সাধুরবে কাঁপে চারিধার—সবে বলে পরিষ্কার অতি পরিষ্কার। দুর্বোধ যা কিছু ছিল হয়ে গেল জল, শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল।" এই শিল্পমাধ্যমের প্রতি আনুগত্যের নামে প্রেমের গল্পকে পরিণত করা যায় ভূতের গল্পে, যুবতী নায়িকাকে পরিণত করা যায় শিশুতে, জীবিতকে করা যায় মৃত, মৃতকে করা যায় জীবিত। এসবই যে করা যায় তা তো অনেক আগেই মেনে নেওয়া হয়েছে। মৃণালবাবুর লেখা থেকে শুধু জানতে পারলাম যে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের কাহিনী নিয়ে তাকে নয়ছয় করার কাজে তিনিও কিছু কম যান না।

প্রত্যেক শিল্পমাধ্যমের নিজস্ব কিছু সমস্যা আছে যা সমাধান করতে হয়, এই কথাটিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যেন সত্যি নূতন কোনো কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ দেশশুদ্ধ শিল্প বিষয়ে ব্যক্তিদের অজ্ঞ বলে ধরে নিয়ে তাদের বোঝানো হয় সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্র দিয়ে—"সংক্ষেপে বলিতে গেলে হিং টিং ছট।" ভয়ে-ভয়ে বলি, বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে পরিচয় আমাদেরও অল্পবিস্তর আছে। ধরুন, একই রাগ কত উপায়ে গাওয়া বা বাজানো যেতে পারে। কণ্ঠে তো বটেই, সেতারে, সরোদে, এসরাজে, বেহালায় এমন কি হারমোনিয়ামে, পিয়ানোতেও। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিল্পীকে রাগের রূপ প্রকাশ করতে বিশেষ কিছু সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে একথা কোনো শিল্পী যদি বলেন যে রাগের প্রতি আনুগত্য আর যন্ত্রের প্রতি আনুগত্য এই দুয়ের দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে মালকোষের কোনো প্রসিদ্ধ রচনাকে এমনিভাবে পুনর্গঠন করে নিলেন যে তা হয়ে গেল পিলু, অথবা কোনো রাগসংগীতই নয়, বিশুদ্ধ জ্যাজ, তো সেই ক্ষেত্রে সেই শিল্পীকে শুনতেই হবে "দাদা, মালকোষ বাজানো আপনার কাজ নয়, আপনি যা পারেন তার বেশি চেষ্টা নাই করলেন।" প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা যেতে পারে রাগের উপর ভিত্তি করে আশি-নব্বইটা যন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ অরকেসট্রা ব্যবহার করে রবিশঙ্কর কনচার্টো রচনা করেছেন, কিন্তু রাগের স্বরূপ থেকে বিচ্যুত হন নি। তেমনি, কেউ শিবের প্রতিমূর্তি আঁকতে পারেন জলরঙে বা তেলরঙে, খোদাই করতে পারেন পাথরে বা কাঠে, অথবা ঢালাই করতে পারেন ব্রোনজে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিবের ভাবের প্রতি আনুগত্য যেমন থাকতে হবে, তেমনি থাকতে হবে মাধ্যমের প্রতি আনুগত্য। এইরকম ক্ষেত্রে কেউ যদি শিব গড়তে বানর গড়ে বসেন, তো মৃণাল সেনরা বোধহয় বলবেন, "আপনি মশাই কিছুই বোঝেন না, এসবই করতে হয় "শিল্পের প্রয়োজনে বিবেকের তাড়নায়, আত্মচিন্তার সমর্থনে এবং সর্বোপরি সময়ের তাগিদে।"

মৃণাল সেন তিনটি বিষয়ের প্রতি 'আনুগত্যের দায়ের' কথা বলেছেন, "লেখকের মূল ভাবনার প্রতি আনুগত্য, দুই, চলচ্চিত্র নামক শিল্পমাধ্যমের প্রতি আনুগত্য এবং তিন, বর্তমান সময়ের প্রতি আনুগত্য।" এই তিন আনু-গত্যের দ্বন্দ্বের জন্যই তাঁর মতে সাহিত্যের সঙ্গে চলচ্চিত্রের 'বোঝাপড়ার' সমস্যার উদ্ভব হয়। তিনি যেহেতু সিনেমা বিষয়ে আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানের অধিকারী, তাঁকে একটা প্রশ্ন করি। এই সমস্যাটা কেবলমাত্র বাঙালি চলচ্চিত্র-কারদের ক্ষেত্রেই ওঠে কেন? চলচিত্রশিল্পে অগ্রণী যেসব দেশ, যথা রাশিয়া, ফ্রানস, আমেরিকা, ইংল্যান্ড—সেইসব দেশে সাহিত্যের সঙ্গে সিনেমার সম্পর্কটা রেশারেশির না বোঝাপড়ার, তাই নিয়ে কোন বিতর্কের কথা কেউ শুনে-ছেন কি? অবশ্য এসব দেশের অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারই তাঁদের শিল্পমাধ্যমের উপযোগী চিত্রনাট্য নিজেরাই তৈরি করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। কোনো প্রসিদ্ধ লেখককে চিত্রনাট্য লিখে দেওয়ার রেওয়াজটা স্মরণীয় ব্যতিক্রম। কিন্তু সেরকম ক্ষেত্রে সেই চিত্রনাট্যের উপর আর পরিচালক হস্তক্ষেপ করেন

বলে মনে হয় না। উদাহরণত, অরসন ওয়েলস অভিনীত ক্যারল রীড পরিচালিত 'দ্য থার্ড ম্যান' ছবির চিত্রনাট্য লিখে দিয়েছিলেন গ্রাহাম গ্রীন। সেই চিত্রনাট্য নিজের নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিতও করেছেন। কিন্তু সাহিত্য-ভিত্তিক সিনেমাও যে ওইসব দেশে একেবারে হয় না, তা তো নয়। শেকসপিয়ারের হ্যামলেট, ওথেলো তো বটেই, আরো বেশ কয়েকটি নাটকের চলচ্চিত্ররূপ আমরা দেখেছি। থিয়েটারের শিল্পমাধ্যমের সঙ্গে সিনেমার শিল্পমাধ্যমের মধ্যে কি আকাশ-পাতাল তফাত। সেই কারণে কি এমন কোনো দুঃসাহসী চিত্রপরিচালকের কথা আমরা জেনেছি যিনি শেকসপিয়ারের কাহিনীতে আর ডায়লগের উপর সামান্যতম আঁচড় কাটতেও সাহস পেয়েছেন? সময়ের প্রতি আনুগত্যের দরুন থিয়েটারে আর সিনেমায় শেকসপিয়ারের নাটকের কত বিভিন্ন ইনটারপ্রিটেশনই না আমরা দেখেছি। কিন্তু কাহিনীকে পরিবর্তিত হতে দেখেছি কি? নাটকের উদাহরণ ছেড়ে উপন্যাসের উদাহরণ হিসেবে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' নামক সুমহান উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপে কথা মনে করতে পারি। অত বড়ো বিশাল একটি উপন্যাসকে কিভাবে সিনেমার মাধ্যমে দেখানো হবে তা নিয়ে দর্শকমাত্রেরই মনে সংশয় দেখা দেয়। কিন্তু কোনো দর্শকই দেখার পর মনে করবেন না যে টলস্টয়ের কাজের উপর পরিচালক খোদার উপর খোদকারি করার চেষ্টা করেছেন। কোনো ইংরেজ, কোনো ফরাসি, কোনো রুশ তাঁদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের প্রতি অতটা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কথা ভাবতেই পারেন না। কেউ ভাবতে পারলেও তাঁরা জানেন যে তাঁদের দেশের রসজ্ঞ মহল তাঁদের ক্ষমা করবেন না। মৃণাল সেন-সত্যজিৎ রায়েরা যা খুশি তাই করতে পারেন, কেননা তাঁরা জানেন বাঙালি দর্শক সমালোচকের মতামতের কোনো তোয়াক্কা না করলেও তাঁদের কিছুই এসে যায় না। তাঁদের পরিচালিত সিনেমার সাফল্য নির্ভর করে এক আন্তর্জাতিক সার্কিটের উপর। সত্যজিৎ রায় বহুদিনই এই সার্কিটের অন্তর্ভুক্ত। মৃণাল সেনও সম্প্রতি প্রবেশপত্র লাভ করেছেন। সার্কিটের আন্তর্জাতিক পৃষ্ঠপোষকরা শেকসপিয়ারকে জানেন, টলস্টয় জানেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চেনেন না, প্রেমচন্দের নামও শোনে নি।

মৃণাল সেন সিনেমা আর সাহিত্যের মধ্যে 'রেশারেশির' সম্পর্ক আর 'বোঝাপড়ার' সম্পর্কের কথা বলেছেন। কিন্তু আরো এক রকমের সম্পর্ক হতে পারে। তা হল পরস্বাপহরণের। জীবিত যেসব লেখক সামান্য কিছু পয়সার বিনিময়ে তাঁদের লেখাকে পরিচালকের হাতে তুলে দেন যেভাবে খুশি বিকৃত করার অনুমতি দিয়ে, তাঁদের নিয়ে আমাদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। আমাদের আপত্তি, আমাদের শোক দুঃখ, সেইসব অমর সাহিত্যকীর্তি নিয়ে যা আমাদের জাতীয় সম্পদ, যার স্রষ্টারা আজ জীবিত নেই যে মৃণাল সেনদের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' করবেন।

অশোক রুদ্র
শান্তিনিকেতন

এ পত্রটির বিষয় গুরুতর। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত স্থানসংকুলানের কথা ভেবে, আপাতত এই বিষয়ে কোনো ব্যাপক আলোচনা আমরা আহ্বান করতে পারছি না। সম্পাদক।

চতুরঙ্গ
চাঁদা—
বার্ষিক ৩৬·০০
ষান্মাসিক ১৮·০০
অ্যাকাউনট পেয়ী চেক
এই নামে দেয় :

ANTARANGA
PRAKASHANI
PVT. LTD.

কর্মসচিব
চতুরঙ্গ
৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা ৭০০ ০১৩

সবিনয় নিবেদন,

আমি আগামী.....মাস থেকে ষান্মাসিক/বার্ষিক গ্রাহক হতে চাই। এই সঙ্গে আমি নগদে/মনি অর্ডারে/চেকে ৩৬/১৮ টাকা চাঁদা পাঠাচ্ছি। আমার কপি নীচের ঠিকানায় আনডার সার্টিফিকেট অব পোস্টিঙ-এ পাঠাবেন।

নাম.....

পেশা.....

পিনকোডসহ ঠিকানা.....

.....

.....